শেষ ব্যোমকেশ কাহিনি

শিশুপাল বধ

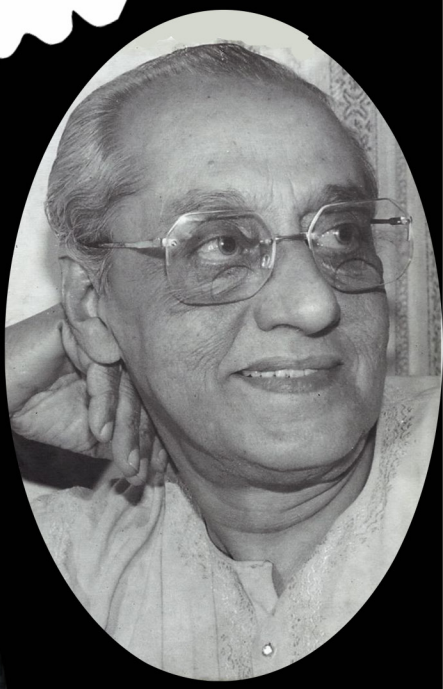

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

নারায়ণ স্যান্যাল

বিশুপাল বধ

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ও
নারায়ণ স্যান্যাল

কুণ্ডু ব্যাক্তিগত পাঠাগার
www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

বিশুপাল বধ

১

কালীচরণ দাসকে পাড়ার লোকে আড়ালে শালীচরণ দাস বলে উল্লেখ করত। শুধু হাস্যরস সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য ছিল না, উদ্দেশ্য গভীরতর। নামের আদ্যাক্ষর বদল করে কোনো রসিক ব্যক্তি কালীচরণ দাসের প্রকৃতি উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছিলেন। আমরা এই কাহিনীতে তাকে শালীচরণ দাস বলেই উল্লেখ করব।

চৌদ্দ বছর আগে শালীচরণ কলকাতার দক্ষিণাংশে বাস করত এবং সামান্য কাজকর্ম করত। বাড়িটি ছোট হলেও দোতলা, শালীচরণ ওপরতলাটা একজনকে ভাড়া দিয়েছিল, নীচের তলায় নিজে সস্ত্রীক থাকত। তার স্ত্রী ছিল বন্ধ্যা। সংসারে আর কেউ ছিল না। তারপর হঠাৎ একদিন বৌ মরে গেল।

কিন্তু সংসার করতে হলে ঘরে একটি স্ত্রীলোক দরকার। শালীচরণের বয়স তখন ত্রিশ বছর, কিন্তু সে আর বিয়ে করল না ; ভেবে-চিন্তে একটি বিধবা এবং অনাথা শালীকে এনে ঘরে বসাল। দূর সম্পর্কের শালী, নাম মালতী, বয়স কম, মাঝারি রকমের সুন্দরী, স্বভাব একটু চপল-চটুল ; কিন্তু সংসারের কাজকর্মে নিপুণা।

মাসখানেক যেতে না যেতেই পাড়ায় কানাঘুষো আরম্ভ হয়ে গেল। শালীচরণের বৌ যতদিন বেঁচে ছিল নিজে গড়িয়াহাটে গিয়ে বাজার করত, পাড়াপড়শীর বাড়িতে যাতায়াত করত, কিন্তু শালী করে না কেন ? শালীচরণ শালীকে ঘরের বাইরে যেতে দেয় না, নিজে বাজার করে কেন ? বৌ-এর চেয়ে শালীর আদর কখন বেশি হয় ?

তার ওপর শালীচরণের বাড়ির দোতলায় যে ভাড়াটে ছিল তাদের বাড়ির মেয়েরা একটা নতুন খবর বিতরণ করল। নীচের তলায় তাদের যাতায়াত ছিল। তারা বলল, শালী যখন প্রথম আসে তখন দুটো ঘরে দুটো আলাদা খাট বিছানা ছিল, এখন কেবল একটা ঘরে একটা বিছানা। ব্যাস্, আর যায় কোথায় ! কালীচরণ দাস শালীচরণ দাসে পরিণত হল।

কিন্তু অপবাদ যে ভিত্তিহীন নয় তা চূড়ান্তভাবে প্রমাণ হল মাস ছয়েক পরে। শালীচরণের বাড়ির পাশের বাড়িতে একটা মেস ছিল, সেখানে বিশ্বনাথ পাল নামে এক যুবক থাকত। তার চেহারা যেমন বলবান তেমনি লাবণ্যময়, শালীচরণের মত বৈশিষ্ট্যহীন নয়। বিশ্বনাথ পাল ভাল অভিনয় করত, যাত্রা এবং সখের থিয়েটার দলে যোগ দিয়েছিল। তার সঙ্গে শালীচরণের শালীর নাম সংযুক্ত হয়ে নতুন করে কানাঘুষো আরম্ভ হল। দুপুরবেলা পুরুষেরা যখন কাজে বেরিয়ে যায় এবং মেয়েরা খাওয়া-দাওয়ার পর দিবানিদ্রায় নিমগ্ন হয় তখন নাকি বিশ্বনাথ পাল খিড়কির দোর দিয়ে শালীচরণের বাড়িতে যায়। এইভাবে কিছুদিন দিবাভিসার চলল। শালীচরণের বোধহয় সন্দেহ হয়েছিল, কিম্বা পাড়ার চ্যাংড়া ছোঁড়ারা হয়তো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপপূর্ণ ইশারা করেছিল। সে একদিন দুপুরবেলা আচমকা খিড়কি দিয়ে বাড়ি ফিরে এল।

অতঃপর যে দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হল তা উহ্য রাখাই ভাল। মোট কথা আদিরস ও রুদ্ররস মিলে নাইট্রোগ্লিসারিনের মত বিস্ফোরক পরিস্থিতিতে পরিণত হল। শালীচরণ মেঘগর্জনের মত শব্দ করে অপরাধীদের আক্রমণ করল। কিন্তু বিশ্বনাথ পালের শরীরে অনেক বেশি শক্তি থাকা

সত্ত্বেও তার মনে পাপ ছিল, সে পদাহত পথ-কুক্কুরের মত পালিয়ে গেল। বাকি রইল শুধু মালতী। শালীচরণ তখন বিকট চীৎকার করে মালতীর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তার গলা টিপে ধরল।

হুড়োহুড়ি চেঁচামেচিতে দোতলা থেকে লোক ছুটে এল, অল্পবয়স্ক বালক বালিকা ও স্ত্রীলোক। দৃশ্য দেখে তারা চীৎকার করে রাস্তার লোক ডাকল। রাস্তা থেকে দু'চার জন লোক এসে অতি কষ্টে শালীচরণের হাত থেকে মালতীর গলা ছাড়ালো। কিন্তু মালতী তখন দম বন্ধ হয়ে মরে গেছে।...

আদালতে শালীচরণের বিচার হল। সে অপরাধ অস্বীকার করল না। শালীর সঙ্গে অবৈধ সহবাসের অভিযোগও মেনে নিল। হাকিম বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, মানুষের হৃদয়ের খবর রাখতেন। শালীচরণের ফাঁসি হল না, গুরুতর আকস্মিক প্ররোচনা বিধায় চৌদ্দ বছরের কারাদণ্ড হল।

শান্তভাবে শালীচরণ জেলে গেল। জেলে যাবার আগে ব্যবস্থা করে গেল : তার বাড়ির দোতলার ভাড়া সলিসিটার আদায় করে ব্যাঙ্কে রাখবেন ; একতলা বন্ধ থাকবে। শালীচরণের বিষয়সম্পত্তি স্থাবর অস্থাবর আর কিছু ছিল না।

বিশ্বনাথ পাল সেই যে পালিয়েছিল, কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে রইল। শালীচরণ জেলে চলে যাবার পর সে আবার আত্মপ্রকাশ করল। তার চেহারা ভাল, উপরন্তু যথেষ্ট অভিনয় নৈপুণ্য থাকায় সে অল্পকালের মধ্যেই চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চের নামজাদা অভিনেতা হয়ে দাঁড়াল। চিত্রপটের চেয়ে রঙ্গালয়ের দিকেই তার ঝোঁক বেশি ; সে দল গঠন করে একটি রঙ্গমঞ্চের অধিকারী হয়ে বসল।

ওদিকে শালীচরণ জেল খাটছিল, যথাকালে মেয়াদ পূর্ণ হলে মুক্তি পেয়ে বেরুল। জেলখানায় সুবোধ বালক হয়ে থাকলে কিছু রেয়াৎ পাওয়া যায়। শালীচরণ চৌদ্দ বছর পূর্ণ হবার আগেই বেরুল। এই কয় বছরে তার বয়স যেমন বেড়েছে তেমনি চেহারারও পরিবর্তন ঘটেছে ; আগে সে ছিল রোগা-পট্‌কা, এখন বেশ চাকন-চিকন হয়েছে। সবচেয়ে পরিবর্তন হয়েছে তার মনে। মুক্তি পেয়েই সে সটান নবদ্বীপে চলে গেল, সেখান মাথা মুড়িয়ে কণ্ঠি ধারণা করে মালা জপ করতে করতে বাড়ি এল।

ইতিমধ্যে পাড়ার পুরোনো বাসিন্দারা অনেকে পাড়া ছেড়ে চলে গেছে, দোতলার ভাড়াটেও বদল হয়েছে, তাই শালীচরণ জেল থেকে ফেরার পর বিশেষ হৈ চৈ হল না। সেও কারুর সঙ্গে মেলামেশার চেষ্টা করল না। একলা থাকে, স্বপাক নিরামিষ খায় আর মালা জপ করে। মাঝে মাঝে সন্ধ্যের পর বেড়াতে বেরোয়। তার অর্থ উপার্জনের দরকার নেই। বারো বছর ধরে যে বাড়িভাড়া জমেছে তাই তার পক্ষে যথেষ্ট। উপরন্তু মাসে মাসে দোতলা থেকে ভাড়া আসে।

২

একটা শনিবার বিকেলে ব্যোমকেশ প্রতুলবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে বলল, 'সত্যবতী দাদার কাছে গিয়েছে, অজিত নিরুদ্দেশ, আমার হাতে কাজ নেই, তাই নিরুপায় হয়ে আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম।'

প্রতুলবাবু বললেন, 'শ্রীমতী সত্যবতীর দাদার কাছে যাওয়া বুঝলাম, মেয়েদের মাঝে মাঝে বাপের বাড়ি যাওয়ার বাসনা দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে। কিন্তু অজিতবাবু নিরুদ্দেশ হলেন কেন ?'

ব্যোমকেশ একটু বিমনাভাবে বলল, 'কি জানি। কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি ভোর হতে না হতে অজিত বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, ফিরে আসে রাত ন'টার পর। প্রশ্ন করলে উত্তর দেয় না, মিটিমিটি হাসে।'

'প্রেমে পড়েননি তো ?'

'অজিতের হৃদয়ে প্রেম নেই, আছে কেবল অর্থলিপ্সা। তাছাড়া প্রেমে পড়ার বয়স পেরিয়ে গেছে।'

'তা বটে। চলুন, তাহলে থিয়েটার দেখে আসি।

'থিয়েটার ?'

'হ্যাঁ। কয়েক মাস থেকে একটা নতুন নাটক চলছে। বিশু পালের দল করছে। খুব ভাল রিপোর্ট পাচ্ছি। চলুন না, দেখে আসা যাক।'

'মন্দ কথা নয়। বোধহয় ত্রিশ বছর থিয়েটার দেখিনি। নাটকের নাম কি ?'

'কীচক বধ।'

'অ্যাঁ—পৌরাণিক নাটক !'

'না না, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। নামটা কীচক বধ বটে কিন্তু পরিস্থিতি আধুনিক ; একজন নবীন নাট্যকার লিখেছেন। বর্তমান যুগেও যে কীচকের অভাব নেই, বরং এ যুগের কীচকেরা সে-যুগের কীচকের কান কেটে নিতে পারে এই হচ্ছে প্রতিভাবান নাট্যকারের প্রতিপাদ্য। স্বয়ং বিশু পাল কীচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।'

'বিশু পাল কে ?'

'নটকেশরী বিশু পালের নাম জানেন না ! দুর্ধর্ষ অ্যাক্টর। চলুন চলুন, দেখে আসবেন।'

'নিতান্তই যদি আপনার রোখ চেপে থাকে—চলুন। নেই কাজ তো খই ভাজ।'

'আচ্ছা, আমি তাহলে টেলিফোনে দুটো সিট রিজার্ভ করে আসি।' প্রতুলবাবু পাশের ঘরে গেলেন।

ব্যোমকেশ কেয়াতলার বাড়িতে আসার পর প্রতুলবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। দু'জনেই বুদ্ধিজীবী ; উপরন্তু প্রতুলবাবু হৃদয়বান পুরুষ, সত্যবতীকে একটি মোটর কিনিয়ে দেবার জন্যে ব্যোমকেশের পিছনে লেগেছিলেন। সত্যবতীর বয়স বাড়ছে, এখন তার পক্ষে পায়ে হেঁটে বাজার করা কিম্বা সিনেমা দেখতে যাওয়া কষ্টকর, এই সব যুক্তি দেখিয়ে তিনি ব্যোমকেশের মন গলাবার চেষ্টা করেছিলেন। ফলে তিনি সত্যবতীর হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন কিন্তু ব্যোমকেশকে বিগলিত করতে পারেননি। ব্যোমকেশের আপত্তি, মোটর কেনার টাকা না হয় কষ্টেসৃষ্টে যোগাড় করা যায়, ছয় সাত হাজার টাকায় একটা সেকেন্ড-হ্যান্ড গাড়ি পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তারপর ? গাড়ি চালাবে কে ? একটা ড্রাইভার রাখতে গেলে মাসে দেড়শো দু'শো টাকা খরচ। ঢাকের দায়ে মনসা বিকিয়ে যাবে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে বেশি বাড়াবাড়ি ভাল নয়। মাথায় চুল নেই লম্বা দাড়ি অত্যন্ত অশোভন।

'সিট পাওয়া গেছে। চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক।' প্রতুলবাবু নিজের মোটরে ব্যোমকেশকে নিয়ে যাত্রা করলেন। অনেক দূর যেতে হবে, শহরের অন্য প্রান্তে। প্রতুলবাবু প্রচণ্ড পণ্ডিত হলে কি হয়, সেই সঙ্গে প্রগাঢ় থিয়েটার প্রেমিক।

এঁরা যখন রঙ্গালয়ের দিকে যাচ্ছিলেন সেই সময় কলেজ স্কোয়ারের এক কোণে গাছের তলায় একটি ভদ্রশ্রেণীর লোক দাঁড়িয়ে কারুর প্রতীক্ষা করছিল। তার হাতে একটি ছোট ব্যাগ, ব্যাগের মধ্যে এক সেট জামা-কাপড়। লোকটি অধীরভাবে ঘন ঘন কব্জির ঘড়ি দেখছিল। যদিও এ পাড়ায় তার চেনা লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের সম্ভাবনা কম, তবু লোকটি রুমাল দিয়ে মুখের নিম্নার্ধ ঢাকা দিয়ে রেখেছিল। এই সময় এখানে ছাত্রদের ভীড় হয়, ছাত্ররা জলভ্রমির মত পুকুরের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে, তন্ময় হয়ে নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। তবু বলা যায় না, পরিচিত কোনো ছাত্র তাকে দেখে চিনে ফেলতে পারে।

গলা খাঁকারির শব্দে চমকে উঠে লোকটি ঘাড় ফেরাল, দেখল অলক্ষিতে কখন একটা লোক তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখে অজস্র দাড়ি গোঁফ, হাতে একটা মোটা লাঠি। লোকটি বলল, 'এনেছি।'

প্রথম ব্যক্তি বলল, 'কোথায় ?'

দ্বিতীয় ব্যক্তি পাশের পকেট থেকে একটি রুমালের মত ন্যাকড়া বার করল। ন্যাকড়ার এক কোণে গিঁট বাঁধা, যেন সুপুরির মত একটা কিছু বাঁধা রয়েছে। প্রথম ব্যক্তি সেটি ভালভাবে দেখে বলল, 'এতে কাজ হবে ?'

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, 'হবে। খুব পাতলা কাচের অ্যাম্পুল। একটু ঠোকা পেলেই ফেটে যাবে।'

আর কোনো কথা হল না। প্রথম ব্যক্তি ব্যাগ থেকে কয়েকটা নোট বার করে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দিল, দ্বিতীয় ব্যক্তি টাকা পকেটে রেখে অ্যাম্পুলটি ভাল করে ন্যাকড়ায় জড়িয়ে প্রথম ব্যক্তিকে দিল। প্রথম ব্যক্তি সেটি সযত্নে জামা-কাপড়ের মধ্যে রেখে দিয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তির পানে চাইল। দ্বিতীয় ব্যক্তির ঝাঁকড়া গোঁফের আড়াল থেকে এক ঝলক হাসি বেরিয়ে এল। সে বলল, 'শুভমস্তু।'

তারপর দু'জনে ভিন্ন দিকে চলে গেল।

প্রতুলবাবু ব্যোমকেশকে পাশে নিয়ে প্রেক্ষাগৃহের প্রথম সারিতে বসেছিলেন। আশেপাশে কয়েকটি সিট খালি ছিল, কিন্তু পিছন দিক একেবারে ভরাট।

সাহেববেশী একটি লোক সামনের সারিতে এসে বসল। তার হাতে একটি ব্যাগ। বসবার পর সে দেখতে পেল পাশেই প্রতুলবাবু ; অপ্রস্তুতভাবে একটু হেসে বলল, 'কেমন আছেন ?'

প্রতুলবাবু বললেন, 'ভাল। আপনি কেমন ?'

দু' এক মিনিট শিষ্টতা বিনিময়ের পর লোকটি উঠে পড়ল, বলল, 'যাই। এদিকে একটা কেসে এসেছিলাম, ভাবলাম দাদাকে দেখে যাই।—আচ্ছা।'

লোকটি ব্যাগ হাতে চলে যাবার পর প্রতুলবাবু বললেন, 'বিশু পালের ছোট ভাই। ডাক্তারি করে।'

ব্যোমকেশ বলল, 'কিন্তু পসার ভাল নয়।'

'না, কষ্টেসৃষ্টে চালায়। কি করে বুঝলেন ?'

'ভাবভঙ্গী পোশাক পরিচ্ছদ দেখে বোঝা যায়।'

ঠিক সাড়ে ছ'টার সময় পর্দা উঠল, নাটক আরম্ভ হল। সাড়ে ন'টা পর্যন্ত চলবে। মাত্র তিনটি অঙ্ক।

গল্পটি মহাভারতের বিরাট পর্ব থেকে অপহৃত হলেও একেবারে মাছিমারা অনুকরণ নয়, যথেষ্ট মৌলিকতা আছে। বস্তুত নাটকের শেষ অঙ্কে ঠিক উল্টো ব্যাপার ঘটেছে, অর্থাৎ বর্তমান কালের কীচক বর্তমান কালের ভীমকে বধ করে দ্রৌপদীকে দখল করেছে। নাটকের চরিত্রগুলির অবশ্য আধুনিক নাম আছে, পাঠকের সুবিধার জন্যে পৌরাণিক নামই রাখা হল।

নাটকের অভিনয় হয়েছে উৎকৃষ্ট। ক্রূর নায়ক কীচকের ভূমিকায় বিশু পালের অভিনয় অতুলনীয়। দ্রৌপদীর চরিত্রে সুলোচনা নাম্নী যশস্বিনী অভিনেত্রী চমৎকার অভিনয় করেছে ; তাছাড়া ভীম অর্জুন সুদেষ্ণা উত্তরা প্রভৃতির চরিত্রও ভাল অভিনীত হয়েছে। সব মিলিয়ে এই নাটকটিতে চিরন্তন মনুষ্য সমাজের বিচিত্র আলেখ্য যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ধর্মোপদেশ বা নীতিকথা শোনাবার চেষ্টা নেই।

প্রতুলবাবু পরমানন্দে থিয়েটার দেখছেন, ব্যোমকেশও আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। নাটক ক্রমশ তৃতীয় অঙ্কে এসে পৌঁছল। এবার চরম পরিণতি।

শেষ দৃশ্যটি হচ্ছে একটি শয়নকক্ষ। কক্ষে আসবাব কিছু নেই, কেবল একটি পালঙ্ক। এটি দ্রৌপদীর শয়নকক্ষ। ভীম পালঙ্কের ওপর চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে, কীচক আসবে।

ইতিপূর্বে ভীমের সঙ্গে দ্রৌপদীর পরামর্শ হয়েছে, দ্রৌপদী কীচককে তার ঘরে ডেকেছে। ভীম দ্রৌপদীর বদলে বিছানায় শুয়ে আছে, কীচক এলেই ক্যাঁক করে ধরবে।

নাটকের পরিসমাপ্তি এই রকম : ভীমের সঙ্গে কীচকের মল্লযুদ্ধ হবে ; কীচক পরাজিত হয়ে মৃত্যুর ভান করে পালঙ্কের পায়ের কাছে পড়ে যাবে, ভীম তখন দ্রৌপদীকে ডাকতে যাবে। মিনিটখানেকের জন্যে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যাবে। তারপর অস্পষ্ট সবুজ আলো জ্বলবে। আস্তে আস্তে আলো উজ্জ্বল হবে। দ্রৌপদীকে নিয়ে ভীম ফিরে আসবে ; কীচক ছুরি নিয়ে পিছন থেকে ভীমকে আক্রমণ করবে। ছুরিকাহত ভীম মরে যাবে। কীচক তখন পৈশাচিক হাস্য করতে করতে দ্রৌপদীকে পালঙ্কের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। যবনিকা।

এবার দৃশ্যের আরম্ভের দিকে ফিরে যাওয়া যাক। ভীম পালঙ্কে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে ; ঘরের আলো খুব উজ্জ্বল নয়, তবে অন্ধকারও নয়। কীচক পা টিপে টিপে প্রবেশ করল, পা টিপে টিপে পালঙ্কের কাছে গেল। তারপর এক ঝটকায় চাদর সরিয়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলো আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

যিনি ভীম সেজেছেন তাঁর বপুটিও কম নয়, শালপ্রাংশু মহাভুজ। কীচক পরম কমনীয়া যুবতীর পরিবর্তে এই ষণ্ডামার্কা পালোয়ানকে দেখে ক্ষণকালের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে গেল, সেই ফাঁকে ভীম দাঁত কড়মড় করে তাকে আক্রমণ করল। কীচকের পকেটে ছুরি ছিল (পরস্ত্রী লোলুপ লম্পটেরা নিরস্ত্রভাবে অভিসারে যায় না) কিন্তু সে তা বের করবার অবকাশ পেল না। দু'জনে ঘোর মল্লযুদ্ধ বেধে গেল।

স্টেজের ওপর এই মরণান্তক কুস্তি সত্যিই প্রেক্ষণীয় দৃশ্য। মনে হয় না এটা অভিনয়। যেন দুটো ক্ষ্যাপা মোষ শিং-এ শিং আটকে যুদ্ধ করছে ; একবার এ ওকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, একবার ও একে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। লোমহর্ষণ লড়াই। শুধু এই লড়াই দেখবার জন্যেই অনেক দর্শক আসে।

শেষ পর্যন্ত কীচকের পরাজয় হল, ভীম তাকে পালঙ্কের পাশে মাটিতে ফেলে বুকে চেপে বসে তার গলা টিপতে শুরু করল। কীচকের হাত-পা এলিয়ে পড়ল, জিভ বেরিয়ে এল, তারপর সে মরে গেল।

ভীম তার বুক থেকে নেমে চোখ পাকিয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলল, ঘাড় চুলকে ভাবল, শেষে স্টেজ থেকে বেরিয়ে দ্রৌপদীকে খবর দিতে গেল।

ভীম নিষ্ক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে স্টেজ ও প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার হয়ে গেল। এই নাটকে আলোর কৌশলে গল্পের নাটকীয়তা বাড়িয়ে দেবার নৈপুণ্য ভারি চমকপ্রদ। শেষ অঙ্কের চরম মুহূর্তে আলো সম্পূর্ণ নিভিয়ে দিয়ে পরিচালক বিশু পাল দর্শকের মনে উৎকণ্ঠা ও আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছে।

মিনিটখানেক পরে দপ্ করে আবার সব আলো জ্বলে উঠল। দেখা গেল কীচক পূর্ববৎ খাটের খুরোর কাছে পড়ে আছে।

দ্রৌপদীকে নিয়ে ভীম প্রবেশ করল। ভীমের ভাবভঙ্গীতে উদ্ধত বিজয়োল্লাস, দ্রৌপদীর মুখে উদ্বেগ। তাদের মধ্যে হ্রস্বকণ্ঠে যে সংলাপ হল তা সংক্ষেপে এই রকম—

দ্রৌপদী : এখন মড়া নিয়ে কী করবে ?

ভীম : কিছু ভেবো না, শেষ রাত্রে মড়া রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসব।

নাটকের নির্দেশ, এই সময় কীচক মাটি থেকে চুপি চুপি উঠে ভীমের পিঠে ছুরি মারবে। কিন্তু কীচক যেমন পড়েছিল তেমনি পড়ে রইল, নড়ন চড়ন নেই। ছুরি মারার শুভলগ্ন অতিক্রম হয়ে যাবার পর ভীম উস্‌খুস্ করতে লাগল, দু'চারটে সংলাপ বানিয়ে বলল, কিন্তু কোনো ফল হল না। ভয়ানক সত্য আবিষ্কার করল প্রথমে দ্রৌপদী। শঙ্কিত মুখে কীচকের কাছে গিয়ে সে চীৎকার করে কেঁদে উঠল, 'অ্যাঁ—একি ! একি— !'

কীচক অর্থাৎ বিশু পাল সত্যি সত্যিই মরে গেছে।

৩

নাটক শেষ হবার পাঁচ মিনিট আগে যবনিকা পড়ে গেল। যেসব দর্শকেরা আগে নাটক দেখেছিল তারা বিস্মিত হল, যারা দেখেনি তারা ভাবল এ আবার কি! কিন্তু কেউ কোনো গোলমাল না করে যে যার বাড়ি চলে গেল।

থিয়েটারের অন্দর মহলে তখন কয়েকজন মানুষ স্টেজের ওপর, কেউ বসে কেউ দাঁড়িয়ে ছিল। কেবল দ্রৌপদী অর্থাৎ সুলোচনা নাম্নী অভিনেত্রী মূর্ছিত হয়ে কীচকের পায়ের কাছে পড়ে ছিল। দারোয়ান প্রভুনারায়ণ সিং দরজা ছেড়ে স্টেজের উইংসে দাঁড়িয়ে অনিমেষ চোখে মৃত কীচকের পানে চেয়ে ছিল।

স্টেজের দরজা অরক্ষিত পেয়ে ব্যোমকেশ প্রতুলবাবুকে নিয়ে ঢুকে পড়েছিল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়, গুরুতর কিছু ঘটেছে সন্দেহ নেই ; সুতরাং অনুসন্ধান দরকার।

স্টেজ থেকে তীব্র আলো আসছে। একটি লোক ব্যাগ হাতে বেরিয়ে দোরের দিকে যাচ্ছিল, প্রতুলবাবু তাকে থামিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কী হয়েছে, ডাক্তার পাল ?'

অমল পাল, যে প্লে আরম্ভ হবার আগে তাদের পাশে গিয়ে বসেছিল, উদ্‌ভ্রান্তভাবে বলল, 'দাদা নেই, দাদা মারা গেছেন।'

'মারা গেছেন ? কী হয়েছিল ?'

'জানি না, বুঝতে পারছি না। আমি পুলিসে খবর দিতে যাচ্ছি।' অমল পাল দোরের দিকে পা বাড়াল।

এবার ব্যোমকেশ কথা কইল, 'কিন্তু—আপনি বাইরে যাচ্ছেন কেন ? যতদূর জানি এখানে টেলিফোন আছে।'

অমল পাল থমকে ব্যোমকেশের পানে চাইল, ধন্ধলাগাভাবে বলল, 'টেলিফোন! হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে বটে অফিস ঘরে—'

এই সময় দারোয়ান প্রভুনারায়ণ সিং এসে দাঁড়াল। লম্বা চওড়া মধ্যবয়স্ক লোক, থিয়েটারের পিছন দিকে কয়েকটা কুঠুরিতে সপরিবারে থাকে আর থিয়েটার বাড়ি পাহারা দেয়। সে অমল পালের পানে চেয়ে ভারী গলায় বলল, 'সাব, মালিক তো গুজর গয়ে। আব্ ক্যা করনা হ্যায় ?'

অমল পাল একটা ঢোক গিলে প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাস দমন করল, কোনো উত্তর না দিয়ে টেলিফোনের উদ্দেশ্যে অফিস ঘরের দিকে চলে গেল। প্রভু সিং ব্যোমকেশের পানে চাইল, ব্যোমকেশ বলল, 'তুমি দারোয়ান ? বেশ, দোরে পাহারা দাও। পুলিস যতক্ষণ না আসে কাউকে ঢুকতে বা বেরুতে দিও না।'

প্রভু সিং চলে গেল। সে সচ্চরিত্র প্রভুভক্ত লোক ; তার সংসারে স্ত্রী আর একটি বিধবা বোন ছাড়া আর কেউ নেই। বস্তুত থিয়েটারই তার সংসার। বিশেষত অভিনেত্রী জাতীয়া স্ত্রীলোকদের সে একটু বেশি স্নেহ করে। এই তার চরিত্রের একটি দুর্বলতা ; কিন্তু নিঃস্বার্থ দুর্বলতা।

ব্যোমকেশ ও প্রতুলবাবু যখন মঞ্চে গিয়ে দাঁড়ালেন তখন তিনজন পুরুষ দ্রৌপদীকে অর্থাৎ অভিনেত্রী সুলোচনাকে ধরাধরি করে তুলে নিয়ে গ্রীনরুমে যাচ্ছে। তারা চলে গেলে স্টেজে রয়ে গেল দু'টি লোক : একটি ছেলেমানুষ গোছের মেয়ে, সে উত্তরার ভূমিকায় অভিনয় করেছিল ; সে পালঙ্কের পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে বিভীষিকা-ভরা চোখে মৃত বিশু পালের মুখের পানে চেয়ে ছিল। সে এখনো উত্তরার সাজ-পোশাক পরে আছে, তার মোহাচ্ছন্ন অবস্থা দেখে মনে হয় সে আগে কখনো অপঘাত মৃত্যু দেখেনি। তার নাম মালবিকা।

দ্বিতীয় ব্যক্তিটি যুবাপুরুষ, সে পালঙ্কের শিয়রের দিকে দাঁড়িয়ে ছিল এবং ক্রমান্বয়ে একবার মৃতের মুখের দিকে একবার মেয়েটির মুখের পানে চোখ ফেরাচ্ছিল। তার খেলোয়াড়ের মত দৃঢ় সাবলীল শরীর এবং সংযত নিরুদ্বেগ ভাব দেখে মনে হয় না যে সে এই থিয়েটারের

আলোকশিল্পী। তার নাম মণীশ, বয়স আন্দাজ ত্রিশ।

ব্যোমকেশ ও প্রতুলবাবু স্টেজে প্রবেশ করে পালঙ্কের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। মৃতের মুখে তীব্র আলো পড়েছে। মুখে মৃত্যুযন্ত্রণার ভান সত্যিকার মৃত্যুযন্ত্রণায় পরিণত হয়েছে। কিম্বা—

'মুখের কাছে ওটা কী?' প্রতুলবাবু মৃতের মুখের দিকে আঙুল দেখিয়ে খাটো গলায় প্রশ্ন করলেন।

ব্যোমকেশ সামনের দিকে ঝুঁকে দেখল, রুমালের মত এক টুক্‌রো কাপড় বিশু পালের চোয়ালের কাছে পড়ে আছে। সে বলল, 'ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। রুমাল নয়। যখন লড়াই হচ্ছিল তখন ওটা চোখে পড়েনি।'

'আমারও না।'

ব্যোমকেশ সোজা হয়ে বলল, 'কোনো গন্ধ পাচ্ছেন?'

'গন্ধ?' প্রতুলবাবু দু'বার আঘ্রাণ নিয়ে বললেন, 'সেন্ট-পাউডার, ম্যাক্‌সফ্যাক্টর, সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ। আর তো কিছু পাচ্ছি না।'

'পাচ্ছেন না? এইদিকে ঝুঁকে একটু ওঁকে দেখুন তো।' ব্যোমকেশ মৃতদেহের দিকে আঙুল দেখাল।

প্রতুলবাবু সামনে ঝুঁকে কয়েকবার নিশ্বাস নিলেন, তারপর খাড়া হয়ে ব্যোমকেশের সঙ্গে মুখোমুখি হলেন, ঘাড় নেড়ে বললেন, 'আপনি ঠিক ধরেছেন। বাদাম তেলের ক্ষীণ গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। তার মানে—'

যারা সুলোচনাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তারা ফিরে এল। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে ব্রজদুলাল, অর্থাৎ ভীম; দ্বিতীয় ব্যক্তিটি থিয়েটারের প্রমপ্‌টার, নাম কালীকিঙ্কর; তৃতীয় ব্যক্তির নাম দাশরথি, সে কমিক অভিনেতা, নাটকে বিরাটরাজার পার্ট করেছে।

তিনজনে অস্বস্তিপূর্ণভাবে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল; মাঝে মাঝে মৃতদেহের পানে তাকাচ্ছে। এ অবস্থায় কি করা উচিত বুঝতে পারছে না। ভীমের হাতে তার ব্যাগ ছিল (পরে দেখা গেল অভিনেতা অভিনেত্রীরা সকলেই বাড়তি কাপড়-চোপড় এবং প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে অভিনয় করতে আসে)। ভীম ব্যাগটি স্টেজের ওপর রেখে নিজে সেখানে বসল; ব্যাগ খুলে আস্ত একটা হুইস্কির বোতল ও গেলাস বার করল, একবার সকলের দিকে চোখ তুলে গভীর স্বরে বলল, 'কেউ খাবে?'

কেউ সাড়া দিল না। ভীম তখন গেলাসে খানিকটা মদ ঢেলে মালবিকার পানে চাইল। মালবিকার মুখ পাংশু, মনে হয় যেন তার শরীর অল্প অল্প টল্‌ছে। স্নায়ুর অবসাদ এসেছে, এখনি হয়তো মূর্ছিত হয়ে পড়বে। ভীম মণীশকে বলল, 'মণীশ, মালবিকার অবস্থা ভাল নয়, এই নাও, একটু জল মিশিয়ে খাইয়ে দাও। নইলে ও যদি আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে, নতুন ঝামেলা শুরু হবে—'

মণীশ তার হাত থেকে গেলাস নিয়ে বলল, 'সুলোচনাদিদির জ্ঞান হয়েছে?'

ভীম বলল, 'এখনো হয়নি। নন্দিতাকে বসিয়ে এসেছি। মণীশ, তুমি মালবিকাকে ওঘরে নিয়ে যাও। ওষুধটা জল মিশিয়ে খাইয়ে দিও, তারপর খানিকক্ষণ শুইয়ে রেখো। দশ মিনিট শুয়ে থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

মণীশ এক হাতে মালবিকার পিঠ জড়িয়ে অন্য হাতে হুইস্কির গেলাস নিয়ে গ্রীনরুমের দিকে চলে গেল। ভীম তখন নিজের পুরুষ্টু গোঁফজোড়া ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে হুইস্কির বোতলের গলায় ঠোঁট জুড়ে চুমুক মারল।

আমাদের দেশের যাত্রা থিয়েটারে ভীমের ইয়া গোঁফ ও গালপাট্টা দেখা যায়; যদিও মহাভারতে বেদব্যাস ভীমকে তূবর বলেছেন। অর্থাৎ ভীম মাকুন্দ ছিল। অবশ্য বর্তমান নাটকে ভীম মাকুন্দ না হলেও ক্ষতি নেই; এ-ভীম সে-ভীম নয়, তার অর্বাচীন বিকৃত ছায়ামাত্র।

লম্বা এক চুমুকে প্রায় আধাআধি বোতল শেষ করে ভীম বোতল নামিয়ে রাখল, প্যাঁচার মত

মুখ করে কিছুক্ষণ বোতলের পানে চেয়ে রইল। তার গোঁফ-বর্জিত মুখখানা অন্য রকম দেখাচ্ছে, ন্যাড়া হাড়গিলের মত। সে কতকটা নিজের মনেই বলল, 'ভীম-কীচকের লড়াই-এর পর আমার রোজই এক গেলাস দরকার হয়, নইলে গায়ের ব্যথা মরে না। আজ এক বোতলেও শানাবে না।'

ব্যোমকেশ এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল, শুনছিল। এখন শান্ত স্বরে প্রশ্ন করল, 'বিশু পাল মদ খেতেন?'

ভীম তার পানে আরক্ত চোখ তুলে চাইল, তারপর মৃতদেহের দিকে একবার চোখ ফিরিয়ে বলল, 'না। ওর দরকার হত না। লোহার শরীর ছিল। কিসে যে মারা গেল—। ডাক্তার অমলকে দেখেছিলাম, সে কোথায় গেল?'

ব্যোমকেশ বলল, 'তিনি পুলিসকে টেলিফোন করতে অফিসে গেছেন। পুলিস এখনি এসে পড়বে। তার আগে আমি আপনাদের দু' একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

ভীম বোতলে আর এক চুমুক দিয়ে বলল, 'করুন প্রশ্ন। আপনি কে জানি না, কিন্তু প্রশ্ন করার হক সকলেরই আছে।'

প্রতুলবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ইনি সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী। থিয়েটার দেখতে এসেছিলাম একসঙ্গে, তারপর এই দুর্ঘটনা।'

ভীমের চোখের দৃষ্টি একটু সতর্ক হল, অন্য দু'জন ঘাড় ফিরিয়ে চাইল। ব্যোমকেশ বলল, 'আজ আপনারা এখানে ক'জন উপস্থিত আছেন?'

ভীম বলল, 'শেষ দৃশ্য অভিনয় হচ্ছিল। সাধারণত শেষ দৃশ্যে যাদের কাজ নেই তারা বাড়ি চলে যায়। আজ বিশু সুলোচনা আর আমি ছিলাম। আর কারা ছিল না ছিল খবর রাখি না।'

কমিক অভিনেতা দাশরথি বলল, 'আমি আর আমার স্ত্রী নন্দিতা ছিলাম।'

ব্যোমকেশ সপ্রশ্ন নেত্রে চাইল। দাশরথির এখন কমিক ভাব নেই, চোখে উদ্বিগ্ন দৃষ্টি। সে ইতস্তত করে বলল, 'বিশুবাবুর সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল, তাই নাটক শেষ হবার অপেক্ষায় ছিলাম। তৃতীয় অঙ্কে আমার প্রবেশ নেই।'

'আর কেউ ছিল?'

'আর মালবিকা ছিল। টেক্‌নিশিয়ানদের মধ্যে মণীশ আর তার সহকারী কাঞ্চনজঙ্ঘা ছিল—'

'কাঞ্চনজঙ্ঘা!'

'তার নাম কাঞ্চন সিংহ, সবাই কাঞ্চনজঙ্ঘা বলে।'

'ও, তিনি কোথায়?'

দাশরথি এদিক ওদিক চেয়ে বলল, 'দেখছি না। কোথাও পড়ে ঘুম দিচ্ছে বোধহয়।'

'আর কেউ?'

এতক্ষণে তৃতীয় ব্যক্তি কথা বলল, 'আর আমি ছিলাম। আমি প্রমপ্‌টার, শেষ পর্যন্ত নিজের জায়গায় ছিলাম।'

'আপনার জায়গা কোথায়?'

প্রমপ্‌টার কালীকিঙ্কর দাস আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ওই যে উইংসের খাঁজের মধ্যে টুল পাতা রয়েছে, ঐখানে।'

স্টেজের ওপর যে ঘরের সেট তৈরি হয়েছিল তার প্রবেশদ্বার মাত্র দু'টি : একটি পিছনের দেয়ালে, অন্যটি বাঁ পাশে ; কিন্তু প্রসিনিয়ামের দু'পাশে থেকে এবং আরো কয়েকটি উইংসের প্রচ্ছন্ন পথে যাতায়াত করা যায়। প্রমপ্‌টার যেখানে দাঁড়ায় সেখানে যাওয়া আসার সঙ্কীর্ণ পথ আছে ; বিপরীত দিকে আলোর কলকব্জা ও সুইচ বোর্ড যেখানে দেয়ালের সারা গায়ে বিছিয়ে আছে সেদিক থেকে স্টেজে প্রবেশের সোজা রাস্তা। আলোকশিল্পীকে সর্বদা স্টেজের ওপর চোখ রাখতে হয়, মাঝখানে আড়াল থাকলে চলে না।

এই সময় পিছনের দরজা দিয়ে মণীশ মালবিকার বাহু ধরে স্টেজে প্রবেশ করল। মালবিকার

ফ্যাকাসে মুখে একটু সজীবতা ফিরে এসেছে। ওরা মৃতদেহের দিকে চোখ ফেরাল না। মণীশ বলল, 'ব্রজদুলালদা, এই নিন আপনার গেলাস। মালবিকা এখন অনেকটা সামলেছে, ওকে এবার বাড়ি নিয়ে যাই ?'

ভীম বলল, 'এখনি যাবে কোথায় ! এখনো পুলিস আসেনি।'

মণীশ সপ্রশ্ন চোখে ব্যোমকেশ ও প্রতুলবাবুর পানে চাইল। ব্যোমকেশ মাথা নাড়ল, 'আমরা পুলিস নই। কিন্তু আপনাকে তো অভিনয় করতে দেখিনি—'

ভীম বলল, 'ও অভিনয় করে না। ও আমাদের আলোকশিল্পী। মণীশ ভদ্র'র নাম শুনেছেন নিশ্চয়—বিখ্যাত সাঁতারু।'

মণীশ বলল, 'আপনিও কম বিখ্যাত নন, ব্রজদুলালদা। এক সময় ভারতবর্ষের চ্যাম্পিয়ন মিড্‌ল-ওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন।'

ভীম গেলাসে মদ ঢালতে ঢালতে বলল, 'সে-সব দিন গেছে ভায়া। বোসো বোসো, আজ রাত দুপুরের আগে কেউ ছাড়া পাচ্ছে না।'

মণীশ বলল, 'কিন্তু কেন ? পুলিস আসবে কেন ? বিশুবাবুর মৃত্যু কি স্বাভাবিক মৃত্যু নয় ? আমার তো মনে হয় ওঁর হার্ট ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়েছিল, লড়াই-এর ধকল সহ্য করতে পারেননি, হার্ট ফেল করে গেছে।'

ভীম বলল, 'যদি তাই হয় তবু পুলিস তদন্ত করবে।'

মণীশ আর মালবিকা পাশাপাশি স্টেজের ওপর বসল। কিছুক্ষণ কোনো কথা হল না। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে ঠিক নেই ; কমিক অভিনেতা দাশরথি ওরফে বিরাটরাজ পকেট থেকে সিগারেট বার করে মৃতদেহের পানে কটাক্ষপাত করে সিগারেট আবার পকেটে পুরল।

ব্যোমকেশ বলল, 'আচ্ছা, একটা কথা। মণীশবাবু এবং শ্রীমতী মালবিকা হলেন স্বামী-স্ত্রী—কেমন ? ওঁরা একসঙ্গে এই থিয়েটারে কাজ করেন। এই রকম স্বামী-স্ত্রী এ থিয়েটারে আরো আছেন নাকি ?'

ভীম গেলাসে এক চুমুক দিয়ে বলল, 'দেখুন, আমাদের এই থিয়েটার হচ্ছে একটি ঘরোয়া কারবার। যারা এখানে কাজ করে, মেয়ে-মদ্দ কাজ করে। যেমন মণীশ আর মালবিকা, বিশু আর সুলোচনা, দাশরথি আর নন্দিতা। আমি অ্যাকটিং করি, আমার স্ত্রী শান্তি মিউজিক মাস্টার—গানে সুর বসায়। শান্তির কাজ শেষ হয়েছে, সে রোজ আসে না। আজ আসেনি। এমনি ব্যবস্থা। ছুট্ লোক বড় কেউ নেই।'

ব্যোমকেশ বলল, 'বুঝলাম। এখন বলুন দেখি, বিশুবাবু মানুষটি কেমন ছিলেন ?'

ভীম মদের গেলাস মুখে তুলল। দাশরথি উত্তেজিত হয়ে বলল, 'সাধু ব্যক্তি ছিলেন। উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, মুক্তহস্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি যেমন অগাধ টাকা রোজগার করতেন তেমনি দু'হাতে টাকা খরচ করতেন। মণীশকে নতুন মোটর কিনে দিয়েছিলেন, আমাদের সকলের নামে লাইফ্-ইনসিওর করেছিলেন। নিজে প্রিমিয়াম দিতেন। এ রকম মানুষ পৃথিবীতে ক'টা পাওয়া যায় ?'

ব্যোমকেশ গম্ভীর মুখে বলল, 'তাহলে বিশুবাবুর মৃত্যুতে আপনাদের সকলেরই লাভ হয়েছে।' একথার উত্তরে হঠাৎ কেউ কিছু বলতে পারল না, মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। শেষে ভীম বলল, 'তা বটে। বিশু নিজের নামে জীবনবীমা করেছিল, কিন্তু উত্তরাধিকারী করেছিল আমাদের। তার মৃত্যুতে বীমার টাকা আমরাই পাব। কিন্তু সামান্য ক'টা টাকার জন্যে বিশুকে খুন করবে এমন পাষণ্ড এখানে কেউ নেই।'

'তাহলে বিশুবাবুর শত্রু কেউ ছিল না ?'

কেউ উত্তর দেবার আগেই বাঁ দিকের দোর দিয়ে ডাক্তার অমল পাল প্রবেশ করল। তার পিছনে একটি হিপি-জাতীয় ছোকরা। মাথার চুলে কপাল ঢাকা, দাড়ি গোঁফে মুখের বাকি অংশ সমাচ্ছন্ন ; আসলে মুখখানা কেমন বাইরে থেকে আন্দাজ করা যায় না। সে মৃতদেহের দিকে

একটি বঙ্কিম কটাক্ষ নিক্ষেপ করে চুপিচুপি মণীশদের পাশে গিয়ে বসল।

দাশরথি বলল, 'এই যে কাঞ্চনজঙ্ঘা! কোথায় ছিলে হে তুমি?'

কাঞ্চনজঙ্ঘা যেন শুনতে পায়নি এমনিভাবে মণীশকে খাটো গলায় বলল, 'ভীষণ মাথা ধরেছিল, মণীশদা। থার্ড অ্যাক্টে আমার বিশেষ কাজ নেই, তাই সিন্ ওঠার পর আমি কলঘরে গিয়ে মাথায় খুব খানিকটা জল ঢাললাম। তারপর অফিস ঘরে গিয়ে পাখাটা জোরে চালিয়ে দিয়ে টেবিলে মাথা রেখে একটু চোখ বুজেছিলাম। অফিসে কেউ ছিল না, তাই বোধহয় একটু ঝিম্‌কিনি এসে গিয়েছিল—'

মণীশ বিরক্ত চোখে তার পানে চাইল। দাশরথি বলল, 'এত কাণ্ড হয়ে গেল কিছুই জানতে পারলে না।'

এবারও কাঞ্চনজঙ্ঘা কোনো কথায় কর্ণপাত না করে মণীশের কাছে আরো খাটো গলায় বোধকরি নিজের কার্যকলাপের কৈফিয়ৎ দিতে লাগল।

ব্যোমকেশ হঠাৎ গলা চড়িয়ে তাকে প্রশ্ন করল, 'আপনার জন্যে বিশুবাবু কত টাকার বীমা করে গেছেন?'

কাঞ্চনজঙ্ঘা চকিতভাবে মুখ তুলল, 'আমাকে বলছেন? বীমা! কই, আমার জন্যে তো বিশুবাবু জীবনবীমা করেননি!'

ব্যোমকেশ বলল, 'করেননি? তবে যে শুনলাম—'

ভীম বলল, 'ওর চাকরির এক বছর পূর্ণ হয়নি, প্রোবেশনে কাজ করছে, কাঁচা চাকরি—তাই—'

কাছেই প্রতুলবাবু ও অমল পাল দাঁড়িয়ে নিম্নস্বরে কথা বলছিলেন, ব্যোমকেশ কাঞ্চনজঙ্ঘাকে আর কোনো প্রশ্ন না করে সেইদিকে ফিরল। অমল পাল অস্বস্তিভরা গলায় বলছিল, 'দাদার সঙ্গে সুলোচনার ঠিক—মানে—ওরা অনেকদিন স্বামী-স্ত্রীর মতই ছিল—'

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করল, 'বিশুবাবু বিয়ে করেননি?'

'করেছিলেন বিয়ে। কিন্তু অল্পকাল পরেই বৌদি মারা যান। সে আজ দশ বারো বছরের কথা। ছেলেপুলে নেই।'

স্টেজের দোরের বাইরে মোটর হর্ন শোনা গেল। একটা পুলিস ভ্যান ও অ্যাম্বুলেন্স এসে দাঁড়িয়েছে। আট দশজন পোষাকী পুলিস ভ্যান থেকে নেমে প্রভু সিং-এর সঙ্গে কথা বলল। তারপর পিল্‌পিল্ করে স্টেজে ঢুকল। একজন অফিসার ব্যোমকেশদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'আমি ইন্সপেক্টর মাধব মিত্র, থানা থেকে আসছি। কে টেলিফোন করেছিলেন?'

'আমি—ডক্টর অমল পাল। আমার দাদা—'

'কি ব্যাপার সংক্ষেপে বলুন।'

অমল পাল স্খলিত স্বরে আজকের ঘটনা বলতে আরম্ভ করলেন, ইন্সপেক্টর মাধব মিত্র ঘাড় একটু কাত করে শুনতে শুনতে স্টেজের চারিদিকে চোখ ফেরাতে লাগলেন; মৃতদেহ থেকে প্রত্যেক মানুষটি তাঁর দৃষ্টি প্রসাদে অভিষিক্ত হল। বিশেষত তাঁর অনুসন্ধিৎসু চক্ষু প্রতুলবাবু ও ব্যোমকেশের পাশে বারবার ফিরে আসতে লাগল। মাধব মিত্রের চেহারা ভাল, মুণ্ডিত মুখে চাতুর্য ও সতর্কতার আভাস পাওয়া যায়; তিনি কেবলমাত্র তাঁর উপস্থিতির দ্বারা যেন সমস্ত দায়িত্বের ভার নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়েছেন।

ডাক্তার পালের বিবৃতি শেষ হলে ইন্সপেক্টর বললেন, 'মৃতদেহ সরানো হয়নি?'

ব্যোমকেশ বলল, 'না। কাউকে কিছুতে হাত দিতে দেওয়া হয়নি। যাঁরা ঘটনাকালে মঞ্চে ছিলেন তাঁরাও সকলেই উপস্থিত আছেন।'

ইন্সপেক্টর ব্যোমকেশের পানে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা—?' তিনি বোধহয় অনুভব করেছিলেন যে এঁরা দু'জন থিয়েটার সম্পর্কিত লোক নন।

প্রতুলবাবু ব্যোমকেশের পরিচয় দিলেন, সহজাত বিনয়বশত নিজের পরিচয় উহ্য রাখলেন।

মাধব মিত্রের মুখ এতক্ষণ হাস্যহীন ছিল, এখন ধীরে ধীরে তাঁর অধর-প্রান্তে একটু মোলায়েম হাসি দেখা দিল। তিনি বললেন, 'আপনি সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী! আপনার যে থিয়েটার দেখার শখ আছে তা জানতাম না।'

ব্যোমকেশ বলল, 'আর বলেন কেন, পণ্ডিত ব্যক্তির পাল্লায় পড়ে এই বিপত্তি। ইনি হলেন—'

ব্যোমকেশ প্রতুলবাবুর পরিচয় দিল। তারপর বলল, 'মাধববাবু, আমরা মৃতদেহের কাছে একটা গন্ধ পেয়েছি। এই বেলা আপনি সেটা শুঁকে নিলে ভাল হয়। গন্ধটা বোধহয় স্থায়ী গন্ধ নয়।'

মাধববাবু ত্বরিতে ফিরে মৃতদেহের কাছে গেলেন, একবার তার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে পাশে নতজানু হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে মৃতের মুখের কাছে মুখ নিয়ে গেলেন।

'বিশ্বাস, শীগ্‌গির ডাক্তার ডেকে নিয়ে এস।'—মাধব মিত্র উঠে দাঁড়িয়ে ব্যোমকেশের দিকে ফিরলেন। তরুণ সাব-ইন্সপেক্টর বিশ্বাস প্রায় দৌড়তে দৌড়তে বাইরে চলে গেল। পুলিসের ডাক্তার পুলিস ভ্যানে অপেক্ষা করছিলেন।

'আপনারা ঠিক ধরেছেন, গন্ধটা সন্দেহজনক।—এই যে ডাক্তার, একবার এদিকে আসুন তো—'

ব্যাগ হাতে প্রৌঢ় ডাক্তার মৃতের কাছে গেলেন, মাধববাবু ক্ষিপ্রস্বরে তাঁকে ব্যাপার বুঝিয়ে দিলেন।

পাঁচ মিনিট পরে শব পরীক্ষা শেষ করে ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন।

'খুব ক্ষীণ গন্ধ, কিন্তু সায়ানাইড সন্দেহ নেই। এখনি মর্গে নিয়ে গিয়ে অটপ্সি করতে হবে, নইলে সায়ানাইডের সব লক্ষণই লুপ্ত হয়ে যাবে।'

'সায়ানাইড কি করে প্রয়োগ করা হল, ডাক্তার?'

ডাক্তার মৃতের কাছ থেকে ন্যাক্‌ড়ার ফালিটা তুলে ধরে বললেন, 'এই কাপড়ের এক কোণে গিঁট বাঁধা রয়েছে দেখছেন? ওর মধ্যে কাচের একটা অ্যাম্‌পুল ছিল, তার মধ্যে তরল সায়ানাইড ছিল। যখন স্টেজ অন্ধকার হয়ে যায় সেই সময় আততায়ী স্টেজে ঢুকে ন্যাক্‌ড়ার খুঁট ধরে মাটিতে আছাড় মারে, অ্যাম্‌পুল ভেঙ্গে যায়। তারপর—বুঝেছেন? হায়ড্রোসায়ানিক অ্যাসিড খুব ভোলাটাইল—মানে—'

'বুঝেছি'—মাধব মিত্র হাত নেড়ে পরিচরদের হুকুম দিলেন। তারা কীচকের মরদেহ ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে গেল। ডাক্তার ন্যাক্‌ড়ার ফালি ব্যাগে পুরে কীচকের অনুগামী হলেন।

অমল পালের গলার মধ্যে একটা চাপা শব্দ হল, যেন সে প্রবল কান্নার বেগ রোধ করবার চেষ্টা করছে।

মাধব মিত্র একবার চারিদিকে তাকালেন, ভীম প্রমুখ কয়েকটি লোক স্টেজের মধ্যে প্রস্তর পুত্তলিকার মত বসে আছে। ভীমের বোতল ব্যাগের মধ্যে অন্তর্হিত হয়েছে। মালবিকার চোখে মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টি। মাধব মিত্র ব্যোমকেশের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'আজ বোধহয় এজাহার নিতে রাত কাবার হয়ে যাবে। আপনাদের অতক্ষণ আটকে রাখব না। কী দেখেছেন বলুন।'

ব্যোমকেশ বলল, 'দেখলাম আর কই। যা কিছু ঘটেছে অন্ধকারে ঘটেছে।'

প্রতুলবাবু বললেন, 'যেমন তেমন অন্ধকার নয়, সূচীভেদ্য অন্ধকার। আমরা চোখ থাকতেও অন্ধ ছিলাম।'

মাধববাবু নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তাহলে আপনাদের আট্‌কে রেখে লাভ নেই। আজ আসুন তবে। যদি কোনো দরকারী কথা মনে পড়ে দয়া করে আমাকে স্মরণ করবেন। আচ্ছা, নমস্কার।'

ব্যোমকেশের ইচ্ছে ছিল আরো কিছুক্ষণ থেকে পরিস্থিতির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে, কিন্তু এ রকম বিদায় সম্ভাষণের পর আর থাকা যায় না। দু'জনে দ্বারের অভিমুখে অগ্রসর হলেন। ব্যোমকেশ যেতে যেতে একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ইন্সপেক্টর অমল পালের সঙ্গে কথা

কইছেন।

দোরের কাছে প্রভু সিং দাঁড়িয়েছিল। ব্যোমকেশ লক্ষ্য করল, দোরের বাইরে থেকে একটি মেয়ে ব্যগ্র চক্ষে স্টেজের দিকে উঁকি মারছে। যুবতী মেয়ে, মুখশ্রী ভাল, শাড়ি পরার ভঙ্গী ঠিক বাঙালী মেয়ের মত নয়। ব্যোমকেশদের আসতে দেখে সে সুট্ করে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ব্যোমকেশ প্রভু সিং-এর কাছে গিয়ে দাঁড়াল, বলল, 'ও মেয়েটি কে?'

প্রভু সিং একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল, 'জি—ও আমার ছোট বোন সোমরিয়া। আমার কাছেই থাকে, থিয়েটারের কাজকর্ম করে, ঝাঁটপাট ঝাড়পোঁছ—এই সব। মালিক ওকে খুব স্নেহ করতেন—'

'হুঁ, সধবা মেয়ে মনে হল। তোমার কাছে থাকে কেন?'

প্রভু সিং বিব্রত হয়ে বলল, 'জি, ওর মরদের সঙ্গে বনিবনাও নেই, তাই আমি নিজের কাছে এনে রেখেছি।'

'তোমার সংসারে আর কেউ আছে?'

'জি, ঔরৎ আছে, বাচ্চা মেয়ে আছে। থিয়েটারের হাতার মধ্যেই আমরা থাকি।'

প্রতুলবাবুর মোটর রাস্তার ধারে পার্ক করা ছিল। সেইদিকে যেতে যেতে ব্যোমকেশ দেখল থিয়েটারের হাতার মধ্যে পুলিসের ভ্যান ছাড়াও আরো দু'টি মোটর দাঁড়িয়ে আছে। একটি সম্ভবত বিশু পালের গাড়ি, আকারে বেশ বড় বিলিতি গাড়ি, খুব নতুন নয়; অন্য গাড়িটি কার অনুমান করা শক্ত। ভীমের হতে পারে, যদি ভীমের গাড়ি থাকে; অমল পাল ডাক্তার, তার গাড়ি হতে পারে; কিম্বা মণীশ ভদ্র'র হতে পারে। বিশু পাল মণীশকে গাড়ি কিনে দিয়েছিল—

এই সব চিন্তার মধ্যে ব্যোমকেশ অনুভব করল সে প্রতুলবাবুর গাড়িতে চড়ে বাড়ির দিকে ফিরে চলেছে। সে অন্যমনস্কভাবে একটা সিগারেট ধরিয়েছে, পাশের অন্ধকার থেকে প্রতুলবাবু বললেন, 'আমি অন্ধকারের মধ্যে স্টেজের ওপর কিছু দেখিনি সত্য, কিন্তু মনে হয় কিছু শুনেছি।'

'কি শুনেছেন?' ব্যোমকেশ তাঁর দিকে ঘাড় ফেরাল।

'একটা মিহি শব্দ।'

'কি রকম মিহি শব্দ?'

'ঠিক বর্ণনা করে বোঝানো শক্ত। এই ধরুন মেয়েরা হাত ঝাড়লে যেমন চুড়ির আওয়াজ হয়, সেই রকম।'

'কাচের চুড়ি, না সোনার চুড়ি?'

'তা বলতে পারি না। আপনি কিছু শুনতে পাননি?'

'আমার কান ওদিকে ছিল না।'

পথে আর কোনো কথা হল না।

৪

পরদিন সকাল আন্দাজ সাড়ে সাতটার সময় ব্যোমকেশ বসবার ঘরে খবরের কাগজটা মুখের সামনে উঁচু করে ধরে গত রাত্রের থিয়েটারের খুনের বিবরণ পড়ছিল। সত্যবতী সকালে বাড়ি ফিরেছে, ব্যোমকেশকে এক পেয়ালা চা খাইয়ে গড়িয়াহাটে বাজার করতে গেছে, ফিরে এসে ব্যোমকেশকে আর এক পেয়ালা চা ও প্রাতরাশ দেবে। বাড়িতে কেবল অজিত আছে।

অন্দরের দিকের দরজা থেকে অজিত উঁকি মারল, দেখল ব্যোমকেশ মুখের সামনে কাগজের পর্দা তুলে দিয়ে খবর পড়ছে। অজিত নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে গুটি গুটি সদর দোরের দিকে অগ্রসর হল। সে প্রায় দোর পর্যন্ত পৌঁচেছে পিছন থেকে শব্দ হল, 'সাত সকালে চলেছ কোথায়?'

ধরা পড়ে গিয়ে অজিত দাঁড়াল, ভারিক্কিভাবে বলল, 'দরকারী কাজে বেরুচ্ছি, টুকে দিলে তো ?'

ব্যোমকেশ কাগজ নামিয়ে বলল, 'বই-এর দোকানের কাজ ?'

গাম্ভীর্য বর্জন করে অজিত মুখ টিপে হাসল।

ব্যোমকেশ বলল, 'তোমার কার্য-কলাপ গতিবিধি ক্রমেই সন্দেহজনক হয়ে উঠছে। বিকাশকে ডেকে তোমার পিছনে টিকটিকি লাগাতে হবে দেখছি।'

'সাত দিন ধৈর্য ধরে থাকো, তারপর আমি নিজেই সব বলব।' অজিত বেরিয়ে গেল।

ব্যোমকেশ আবার কাগজ তুলে নিল। থিয়েটারে পুলিস প্রায় দেড়টা পর্যন্ত ছিল, থিয়েটারের আগাপাস্তলা তন্ন তন্ন করেছে ; থিয়েটার সংশ্লিষ্ট যাবতীয় স্ত্রী পুরুষের জবানবন্দী নেওয়া হয়েছে। কেবল খ্যাতনামা অভিনেত্রী সুলোচনা শোকাভিভূত থাকার জন্য এজাহার দিতে পারেননি। লাশ রাত্রেই ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছিল, লাশ-পরীক্ষক ডাক্তার বলেন, মৃতের শ্বাসনালী ও ফুস্‌ফুসের মধ্যে সাইনোজেন গ্যাসের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে, ওই ভয়ঙ্কর বিষই মৃত্যুর কারণ। মামলার পুলিস ইন-চার্জ ইন্সপেক্টর মাধব মিত্র মনে করেন, বিশু পালের মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, কেউ তাকে খুন করেছে। কিন্তু চিন্তার কারণ নেই, পুলিস তৎপর আছে, শীঘ্রই আসামী ধরা পড়বে। ওকুস্থলে অর্থাৎ প্রেক্ষাগৃহে ব্যোমকেশ ও প্রতুলবাবু উপস্থিত ছিলেন কাগজে সে কথারও উল্লেখ আছে।

বাইরে সত্যবতীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, সে বাজার করে ফিরেছে। তার পিছনে প্রতুলবাবু দু'হাতে দু'টি পরিপুষ্ট থলে নিয়ে আসছেন, মুখে একটু অপ্রতিভ হাসি। সত্যবতী ঘরে ঢুকে বলল, 'ওগো, দ্যাখো কে এসেছেন। উনিও গড়িয়াহাটে বাজার করতে গিয়েছিলেন—ধরে নিয়ে এলুম।'

ব্যোমকেশ হেসে উঠে দাঁড়াল, বলল, 'বাঃ, বেশ।—সত্যবতী ঝাঁকামুটের কাজটা আপনাকে দিয়েই করিয়ে নিয়েছে দেখছি।'

'যাঃ, তা কেন ? উনি নিজেই আমার হাত থেকে থলি কেড়ে নিলেন।—আপনারা বসে গল্প করুন, আমি চা তৈরি করে আনছি।' নিজের থলি প্রতুলবাবুর হাত থেকে নিয়ে সত্যবতী ভেতরে চলে গেল।

প্রতুলবাবু নিজের থলিটি নামিয়ে রেখে ব্যোমকেশের সামনের চেয়ারে বসলেন, বললেন, 'কাগজে কালকের কীচক বধের খবর পড়ছেন দেখছি। আমিও পড়েছি।—আচ্ছা, কাল থিয়েটার থেকে ফিরতে ফিরতে আপনাকে একটা কথা বলেছিলাম মনে আছে ?'

'কি কথা, চুড়ির ঝনাৎকার ?'

'হ্যাঁ, কাল থেকে চিন্তাটা মনের পিছনে লেগে আছে, পুলিসকে একথা জানানো উচিত কিনা।'

ব্যোমকেশ একটু নীরব থেকে প্রশ্ন করল, 'ঝনাৎকার শব্দ স্টেজ থেকে এসেছিল এ বিষয়ে আপনি ষোল আনা নিঃসংশয় ?'

প্রতুলবাবু বললেন, 'দেখুন, অন্ধকারে বসে থাকলে কোন্ দিক থেকে আওয়াজ আসছে সব সময় ধরা যায় না। তবু, স্টেজ থেকে যে আওয়াজটা এসেছিল এ বিষয়ে আমি বারো আনা নিঃসংশয়।'

'তাহলে পুলিসকে বলা উচিত। ওরা যদি তা থেকে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হয়—'

এই সময় সদর দোরের কাছ থেকে আওয়াজ এল, 'আসতে পারি ?'

ব্যোমকেশ মুখ তুলে বলল, 'এস এস, রাখাল। তোমাদের কথাই হচ্ছিল।'

ইন্সপেক্টর রাখাল সরকার প্রবেশ করলেন, হেসে বললেন, 'দু'জন আসামীই উপস্থিত আছেন দেখছি।'

ব্যোমকেশ বলল, 'বসো। তোমার কি কাজকর্ম নেই, সকালবেলাই থানা ছেড়ে বেরিয়েছ যে !'

রাখালবাবু বললেন, 'কাজকর্ম ঢিমে। কাগজে আপনাদের দু'জনের নাম দেখলাম। আপনারা আমার এলাকার লোক, তাই ভাবলাম তদারক করে আসি।'

সত্যবতী ট্রে'র ওপর দু' পেয়ালা চা ও রাশীকৃত চিঁড়ে ভাজা নিয়ে এল। রাখালবাবু বললেন, 'বৌদি, আমিও আছি। আর এক পেয়ালা চাই।'

আর এক পেয়ালা চা এল। তিনজনে চায়ের অনুপান সহযোগে চিঁড়ে ভাজা খেতে খেতে গত রাত্রির থিয়েটারী হত্যাকাণ্ডের আলোচনা করতে লাগলেন।

চিঁড়ে ভাজা নিঃশেষ হলে রাখালবাবু চায়ের পেয়ালায় অন্তিম চুমুক দিয়ে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, 'ব্যোমকেশদা, এ পাড়ায় শালীচরণ দাস নামে কাউকে চেনেন ?'

ব্যোমকেশ বলল, 'শালীচরণ দাস ! নামের একটা মহিমা আছে বটে কিন্তু আমি চিনি না। কে তিনি ?'

রাখালবাবু বললেন, 'বছর বারো আগে আমি এই থানাতেই সাব-ইন্সপেক্টর ছিলাম। তখন শালীচরণকে নিয়ে বেশ কিছুদিন হৈ চৈ চলেছিল।'

'হৈ চৈ কিসের ? কী করেছিলেন তিনি ?'

'শালীকে খুন করেছিল।'

'শালীচরণ শালীকে খুন করেছিল !'

'এবং বিশু পালের সঙ্গে এই ঘটনার কিছু যোগাযোগ আছে।'

'তাই নাকি ! বল বল, শুনি। —প্রতুলবাবু, আপনার গল্প শুনতে আপত্তি নেই তো ?'

প্রতুলবাবু বললেন, 'গল্প শুনতে কার আপত্তি হতে পারে ? আমি এ পাড়ার পুরনো বাসিন্দা, শালীচরণ নামটা যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। আজ রবিবার, ভেবেছিলাম সকালবেলা একটু লেখাপড়া করব। তা গল্পই শোনা যাক।'

অতঃপর রাখালবাবু শালীচরণের অতীত কাহিনী বললেন। গল্প শুনে ব্যোমকেশ বলল, 'শালীচরণ এখন কোথায় ? জেল থেকে বেরিয়েছে ?'

রাখালবাবু বললেন, 'মাসখানেক হল। জেলখাটা কয়েদীদের খবরাখবর আমাদের রাখতে হয়—'

'কোথায় আছে ?'

'নিজের বাড়ির একতলায় উঠেছিল। আজ কোথায় আছে জানি না। খোঁজ নিতে পারি।'

ব্যোমকেশ প্রতুলবাবুর দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করে বলল, 'আজ ছুটির দিন, একটু সত্যান্বেষণে বেরুলে কেমন হয় ? শালীচরণ আমার মনোহরণ করেছে। যাবেন তার বাড়িতে তত্ত্ব-তল্লাশ নিতে ?'

প্রতুলবাবু বললেন, 'বেশ তো, চলুন না। আমি কখনো খুনী আসামী দেখিনি, একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে। উঠুন তাহলে। আমার গাড়ি রয়েছে, তাতেই যাওয়া যাক।'

তিনজনে গিয়ে গাড়িতে উঠলেন। রাখালবাবু ড্রাইভারকে পথ নির্দেশ করার জন্যে সামনের সিটে বসলেন।

যেতে যেতে ব্যোমকেশ প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, রাখাল, মাধব মিত্তিরকে তুমি চেন ?'

রাখালবাবু ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, 'চিনি। ওঁর সঙ্গে কিছুদিন একসঙ্গে কাজ করেছি।'

'লোকটি কেমন বল তো ?'

রাখালবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'খুব হুঁশিয়ার কাজের লোক, আর ভারি মুখমিষ্টি। কিন্তু নিজের এলাকায় কাউকে নাক গলাতে দেন না।'

'হুঁ।' ব্যোমকেশ প্রতুলবাবুর পানে চেয়ে একটু হাসল।

পাঁচ মিনিট পরে রাখালবাবুর নির্দেশ অনুসরণ করে মোটর একটি বাড়ির সামনে থামল। অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তার ওপর ছোট দোতলা বাড়ি ; বাড়ির গায়ে জীর্ণতার ছাপ পড়েছে। তিনজনে মোটর থেকে অবতীর্ণ হয়ে বাড়ির সদরে এসে দেখলেন দরজায় তালা ঝুলছে।

তিনজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। বাড়িতে তালা লাগিয়ে শালীচরণ কোথায় গেল ? বাজারে ?

সদর দোরের মাথায় দোতলায় একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যালকনি ছিল, এক ভদ্রলোক সেখান থেকে নীচে উঁকি মারলেন, 'কাকে চান ?'

নীচে তিনজন ঊর্ধ্বমুখ হলেন। রাখালবাবু বললেন, 'শালী—মানে কালীচরণ দাস আছেন ?'

ত্রিশঙ্কুর মত ভদ্রলোক বললেন, 'না, তিনি বাইরে গেছেন।'

'কোথায় গেছেন ?'

'দাঁড়ান, আমি আসছি।' ত্রিশঙ্কু ব্যালকনি থেকে অদৃশ্য হলেন।

অল্পক্ষণ পরে বাড়ির পাশের দিক থেকে ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন। মধ্যবয়স্ক লোক, কিন্তু ভাবভঙ্গীতে চটুলতার আভাস বয়সের অনুকূল নয়। বললেন, 'আমি কালীচরণবাবুর ভাড়াটে। ওপরতলায় থাকি। আপনারা কি তাঁর বন্ধু ?'

ব্যোমকেশ হেসে বলল, 'অন্তত শত্রু নয় ; দর্শনার্থী বলতে পারেন। তিনি কোথায় ?'

ভদ্রলোক হাসি-হাসি মুখে বললেন, 'তিনি বোষ্টুমীকে নিয়ে বৃন্দাবন গেছেন।'

ব্যোমকেশ ভ্রূ তুলে বলল, 'বৃন্দাবন ! বোষ্টমী !'

ভদ্রলোকের মুখের হাসি আর একটু প্রকট হল, 'আজ্ঞে। আমার বাসায় একটি কমবয়সী ঝি কাজ করত, দেখতে শুনতে ভাল, বোধহয় বিধবা। কাজকর্ম ভালই করছিল, তারপর কালীচরণবাবু জেল থেকে ফিরে এলেন। একলা মানুষ হলেও তাঁর একজন ঝি দরকার, চপলা—মানে আমার ঝি তাঁর কাজও করতে লাগল। কিছুদিন যেতে না যেতেই চপলা আমার কাজ ছেড়ে দিল, কেবল কালীচরণবাবুর কাজ করে। তারপর দেখলাম চপলা গলায় কণ্ঠি পরে বৈষ্ণবী হয়েছে। ক্রমে সন্ধ্যার পর নীচের তলা থেকে খঞ্জনির আওয়াজ আসে ; যুগল-কণ্ঠে গান শোনা যায়—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে—

'দিন দশেক আগে একদিন সন্ধ্যেবেলা কালীচরণবাবু এক থালা মালপো আর পরমান্ন নিয়ে দোতলায় এলেন, সলজ্জভাবে জানালেন চপলা বোষ্টুমীকে তিনি কণ্ঠি-বদল করে বিয়ে করেছেন।'

নিঃশব্দ হাসিতে ভদ্রলোকের মুখ ভরে গেল।

ব্যোমকেশ চুলের মধ্যে দিয়ে আঙুল চালিয়ে বলল, 'তাই তো। কবে বাইরে গেলেন ?'

'কাল সকালে।'

'সকালে ?'

'আজ্ঞে। ভোরবেলা ওপরতলায় এসে আমাকে নীচের তলার চাবি দিয়ে বললেন, আমরা বৃন্দাবন যাচ্ছি বেলা দশটার ট্রেনে, হপ্তা দুই পরে ফিরব। এই বলে বোষ্টুমীকে ট্যাক্সিতে তুলে চলে গেলেন। বৃন্দাবনে নাকি কোন্ আখড়ায় মোচ্ছব আছে।'

ব্যোমকেশ রাখালবাবুর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল, প্রতুলবাবু বললেন, 'এটা বোধহয় বৈষ্ণবীয় হনিমুন।'

তারপর রসিক ভদ্রলোকটিকে ধন্যবাদ ও নমস্কার জানিয়ে তিনজনে গাড়িতে এসে উঠলেন। প্রতুলবাবু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'খুনী আসামী দেখা আমার ভাগ্যে নেই।'

পাঁচ-ছয় দিন বিশুপাল বধ সম্বন্ধে আর কোনো নতুন খবর পাওয়া গেল না ; সংবাদপত্রে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠা ছেড়ে অন্দরমহলে গা-ঢাকা দিয়েছে। মাধব মিত্রের সাড়াশব্দ নেই। ভাবগতিক দেখে মনে হয় তিনি মামলার কোনো কিনারা করতে পারেননি, আসামী এখনো অজ্ঞাত।

ব্যোমকেশের হাতে অন্য কোনো কাজ ছিল না, তাই তার মনটা থিয়েটারী হত্যার দিকে পড়ে থাকত। শনিবার বিকেলবেলা সে প্রতুলবাবুকে ফোন করবে মনস্থ করেছে এমন সময় ফোন বেজে উঠল। স্বয়ং প্রতুলবাবু ফোন করছেন। তিনি বললেন, 'এইমাত্র ইন্সপেক্টর মাধব মিত্রের

পরোয়ানা এসেছে। তিনি আমার বাসায় আসছেন। আপনাকেও হাজির থাকতে হবে। বোধহয় হালে পানি পাচ্ছেন না।'

ব্যোমকেশ বলল, 'হুঁ। আপনি তাকে কঙ্কণ ঝনাৎকারের কথা বলেছেন নাকি ?'

'না। তিনি এলে বলব।'

'আর শালীচরণ দাসের রোমান্স ?'

'না, দরকার বোধ করেন আপনি বলবেন।'

'আচ্ছা, আমি এখনি বেরুচ্ছি।'

'গাড়ি পাঠাব ?'

'না না, দরকার নেই। দশ মিনিটের তো রাস্তা।'

'গাড়ি থাকলে দু' মিনিটে আসা যেত।'

ব্যোমকেশ হেসে বলল, 'হুঁ। বুঝেছি আপনার ইঙ্গিত।'

পনেরো মিনিট পরে ব্যোমকেশ প্রতুলবাবুর বাড়িতে দোতলার বারান্দায় গিয়ে বসতে না বসতেই মাধব মিত্র উপস্থিত হলেন। তাঁর হাতে চামড়ার মোটা ফাইল। টেবিলের ওপর ফাইল রেখে তিনি বিনীত হাস্য করলেন, 'বিরক্ত করতে এলাম। ভেবেছিলাম আপনাদের কষ্ট দেব না, কিন্তু গরজ বড় বালাই। আপনারা সে-রাত্রে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন ; যদিও চোখে কিছু দেখেননি, তবু আপনাদের উপস্থিতিই আমার কাছে মূল্যবান। আপনারা জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি, পরম পণ্ডিত। আপনাদের মানসিক সহযোগিতা পেলেই আমরা কৃতার্থ হয়ে যাব।'

লোকটির মিষ্টি কথা বলবার ক্ষমতা আছে বটে। কিন্তু ব্যোমকেশও হার মানবার পাত্র নয়। সে বলল, 'সে কি কথা ! পুলিসকে সাহায্য করা তো প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। তাছাড়া আপনি যে রকম মিষ্টভাষী সজ্জন ব্যক্তি আপনাকে সাহায্য করা তো গৌরবের কথা। আমরা কি করতে পারি বলুন। সে-রাত্রে থিয়েটার থেকে চলে আসার পর কী ঘটেছিল আমরা কিছুই জানি না ; খবরের কাগজে যা পড়েছি তা ধর্তব্য নয়। এইটুকু শুধু জানি যে অজ্ঞাত আসামী এখনো সনাক্ত হয়নি।'

প্রতুলবাবু ইতিমধ্যে চা ফরমাস করেছিলেন, সঙ্গে এক প্লেট প্যাস্ট্রি। মাধববাবু এক চুমুক চা খেয়ে প্যাস্ট্রিতে কামড় দিলেন, চিবোতে চিবোতে বললেন, 'না, সনাক্ত হয়নি। তবে জাল খানিকটা গুটিয়ে এনেছি। ঘটনাকালে যে দশজন মঞ্চে উপস্থিত ছিল তাদের মধ্যে ছাঁটাই করে গুটি তিনেক লোককে দাঁড় করানো গেছে। মুশকিল কি হয়েছে জানেন, ওদের সকলেরই একটা না একটা মোটিভ আছে। তাহলে গোড়া থেকে বলি শুনুন—

'আপনারা চলে আসবার পর থিয়েটারের মঞ্চ গ্রীনরুম অডিটোরিয়াম, তারপর হাতার মধ্যে প্রভুনারায়ণের কোয়ার্টার—সব খানাতল্লাশ করলাম ; স্টেজের দোরের কাছে দুটো মোটর ছিল—একটা বিশু পালের, দ্বিতীয়টা মণীশ ভদ্র'র—সে দুটোও খুঁজে দেখলাম, কিন্তু সন্দেহজনক কিছু পাওয়া গেল না। আর্টিস্টরা সবাই ব্যাগ হাতে করে অভিনয় করতে আসে, তাদের ব্যাগের মধ্যেও সাধারণ কাপড়-চোপড় পাউডার লিপস্টিক ছাড়া বিশেষ কিছু নেই। কেবল মালবিকার ব্যাগে একটা নরুনের মত ধারালো ছুরি আর ব্রজদুলালের ব্যাগে এক বোতল হুইস্কি পাওয়া গেল। তারপর নিষ্ফল বডি সার্চ।'

মাধব মিত্র চায়ের পেয়ালা শেষ করে রুমালে মুখ মুছলেন, বললেন, 'অতঃপর সাক্ষীদের জবানবন্দী নিতে শুরু করলাম। প্রথমে বিশু পালের ভাই অমল পাল—'

ব্যোমকেশ হাত তুলে বলল, 'জবানবন্দী মুখে বলতে গেলে অনেক কথা বাদ পড়ে যাবে। তার চেয়ে যদি জবানবন্দীর নথি আপনার কাছে থাকে—'

মাধববাবু ফাইলের ওপর হাত রেখে একটু দ্বিধাভরে বললেন, 'আছে। একটা কপি সর্বদাই সঙ্গে থাকে। কিন্তু—মুশকিল কি জানেন, ফাইল হাতছাড়া করার নিয়ম নেই। যাহোক, এক কাজ করা যেতে পারে, আমি বসছি, আপনি ফাইলে চোখ বুলিয়ে নিন। আপনার পড়াও হবে,

নিয়ম রক্ষেও হবে। কি বলেন ?'

ব্যোমকেশ নিস্পৃহ স্বরে বলল, 'দেখুন, আমার কোনো আগ্রহ নেই। আপনার যদি আগ্রহ থাকে তবেই জবানবন্দী পড়ব।'

মাধববাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'না না, সে কি কথা ! আমার আগ্রহ আছে বলেই না আপনার কাছে এসেছি।' তিনি ফাইল থেকে টাইপ করা ফুলস্ক্যাপ কাগজের একটা নথি বার করে ব্যোমকেশের দিকে এগিয়ে দিলেন, 'এই নিন। আপনি পড়ুন, আমি না হয় ততক্ষণ প্রতুলবাবুর সঙ্গে পাশের ঘরে বসে গল্প করি।'

ব্যোমকেশ নথি টেনে নিয়ে বলল, 'মন্দ কথা নয়। প্রতুলবাবু আপনাকে কিছু নতুন খবর দিতে পারবেন। আমিও একটা খবর দেব। আগে জবানবন্দী পড়ি। ডাক্তারের ময়না তদন্তের রিপোর্ট নথিতে আছে নাকি ?'

'আছে। তিনি ডাক্তারি পরিভাষার কচ্‌কচি রিপোর্টে যথাসম্ভব সরল করে দিয়েছেন।'

ব্যোমকেশ সিগারেট ধরিয়ে জবানবন্দীর নথির পাতা খুলে পড়তে আরম্ভ করল।

থিয়েটারের অফিস ঘরে বসে মাধব মিত্র একের পর এক সাক্ষী ডেকে তাদের এজাহার নিয়েছিলেন। একজনের এজাহার নেবার সময় অন্য কোনো সাক্ষী উপস্থিত ছিল না।

অমল পাল। বয়স—৩৯। জীবিকা—ডাক্তারি। ঠিকানা—* * গোলাম মহম্মদ রোড, দক্ষিণ কলিকাতা।

মৃত বিশ্বনাথ পাল আমার দাদা ছিলেন। আমরা দুই ভাই ; আমি কনিষ্ঠ। দাদা আমার পড়ার খরচ দিয়ে ডাক্তারি পড়িয়েছিলেন। আমি দক্ষিণ কলকাতায় প্র্যাক্‌টিস করি, দাদা থিয়েটারের কাছে থাকার জন্যে শ্যামবাজারে থাকতেন। তিনি বিপত্নীক ও নিঃসন্তান ছিলেন। শ্যামবাজারের বাসায় অভিনেত্রী সুলোচনা তাঁর সঙ্গে থাকত। আমার সুযোগ হলে আমি থিয়েটারে এসে কিম্বা শ্যামবাজারের বাসায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতাম। তাঁর সঙ্গে আমার পরিপূর্ণ সদ্ভাব ছিল, তিলমাত্র মনোমালিন্য কোনো দিন হয়নি।

দাদা উদার চরিত্রের মানুষ ছিলেন, পরোপকারী ছিলেন। তিনি পনেরো হাজার টাকার লাইফ ইন্‌সিওর করে আমাকে তার ওয়ারিশ করেছিলেন। শুনেছি থিয়েটারের আরো অনেক লোককে লাইফ ইন্‌সিওরের ওয়ারিশ করেছিলেন। কাউকে দশ হাজার, কাউকে পাঁচ হাজার। তিনি অজস্র টাকা রোজগার করতেন, কোনো বদ্‌খেয়াল ছিল না ; যাদের ভালবাসতেন তাদের দু'হাত ভরে দিতেন।

নৈতিক চরিত্র ? তিনি আমার গুরুজন ছিলেন, তাঁর নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে কোনো কথা বলবার অধিকার আমার নেই। সুলোচনার সঙ্গে ওঁর বিবাহিত সম্বন্ধ না থাকলেও ওঁরা স্বামী-স্ত্রীর মতই থাকতেন।

দাদার শত্রু ? শত্রু কেউ ছিল বলে তো মনে হয় না। সকলেই তাঁর অনুগৃহীত, শত্রুতা কে করবে ?

আমি আজ এ পাড়ায় একটা 'কল'এ এসেছিলাম, ভাবলাম দাদার সঙ্গে দুটো কথা বলে যাই ; তাই থিয়েটারে এসেছিলাম। আমার ডাক্তারি প্র্যাক্‌টিস মোটের ওপর মন্দ নয়। আমি বিবাহিত ; তিনটি মেয়ে দু'টি ছেলে।

আজ নাটক শেষ হবার ঠিক আগে যখন এক মিনিটের জন্যে আলো নিভিয়ে দেওয়া হল তখন আমি স্টেজের পিছন দিকে একটা টুলের ওপর বসে সিগারেট টানছিলাম। তখন কে কোথায় ছিল, নিজের জায়গা থেকে নড়েছিল কিনা আমি লক্ষ্য করিনি। আলো জ্বলার পরে আবার অভিনয় আরম্ভ হল, কিছুক্ষণ পরে চীৎকার কান্না হৈ হৈ, ড্রপসিন পড়ে গেল। তখন আমি স্টেজে এসে দেখলাম—

আমি ডাক্তার, কিন্তু দাদার মৃত্যুর কারণ আমি বুঝতে পারিনি। এত অল্প সময়ের মধ্যে

মৃত্যু—হার্ট ফেলিওর হতে পারে। কিন্তু দাদার হার্ট দুর্বল ছিল না, কয়েক দিন আগে আমি পরীক্ষা করেছি। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ পোস্ট-মর্টেমে জানা যাবে। এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত, এখনো ঠিক ধারণা করতে পারছি না।

দাদা যদি উইল করে গিয়ে থাকেন তাহলে কে তাঁর উত্তরাধিকারী আমি জানি না, সলিসিটার সিংহ-রায়ের অফিসে খোঁজ নিয়ে জানা যাবে। যদি উইল না থাকে তাহলে সম্ভবত আমিই তাঁর উত্তরাধিকারী। তাঁর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি কী আছে আমি জানি না।

ব্রজদুলাল ঘোষ। বয়স—৪২। জীবিকা—নাট্যাভিনয়। ঠিকানা—* * শ্যামপুকুর লেন।

ইন্সপেক্টরবাবু, আপনি সুলোচনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সে এখনো সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হয়নি। আপনি আগে আমাকে প্রশ্ন করুন। আমার এজাহার শেষ হলে সুলোচনা আসবে।

প্রশ্ন : আপনি এই নাটকে ভীমের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ?

উত্তর : হ্যাঁ। বিশু যতগুলি নাটক মঞ্চস্থ করেছিল সব নাটকেই আমি অভিনয় করেছি।

প্রশ্ন : কতদিন তাঁর সঙ্গে আছেন ?

উত্তর : তা প্রায় দশ বছর। বিশু যখন নিজের দল তৈরি করে আসরে নামল তখন থেকে আমি ওর সঙ্গে আছি।

প্রশ্ন : আপনার মত আর কেউ গোড়া থেকে আছে ?

উত্তর : গোড়া থেকে—। আছে। কমিক অভিনেতা দাশরথি চক্কোত্তি আর তার বৌ নন্দিতা। অন্য যারা ছিল তারা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রশ্ন : আপনাদের কারুর সঙ্গে বিশু পালের অসদ্ভাব ছিল ?

উত্তর : দেখুন, কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করে জলে বাস করা যায় না। কার মনে কি আছে জানি না, কিন্তু বাইরে কোনো অসদ্ভাব ছিল না। বিশু ছিল দিলদরিয়া মেজাজের লোক, দলের লোককে সে ঘরের লোক বলে মনে করত। এমন অমায়িক চরিত্র দেখা যায় না।

প্রশ্ন : বিশু পালের চরিত্রে কোনো দোষ ছিল না ?

উত্তর : একটু আধটু দোষ কার না থাকে ? ঠক্ বাছতে গাঁ উজোড়। বিশু মরে গেছে, কিন্তু আমি গলা ছেড়ে বলতে পারি সে উঁচু মেজাজের সজ্জন ব্যক্তি ছিল। যারা তার দলে কাজ করেছে তারা সপরিবারে কাজ করেছে। সমস্ত থিয়েটারটাই একটা পারিবারিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেন আমাদের সকলের এজমালি থিয়েটার। এখন সে মরে গেছে, এরপর কী হবে জানি না।

প্রশ্ন : আচ্ছা, এবার আপনার ঘরের কথা কিছু জিজ্ঞেস করি। আপনার পরিবারে কে কে আছে ?

উত্তর : বুড়ি পিসি আছেন। আমার স্ত্রী শান্তি আছে আর একটি মেয়ে আছে। মেয়ে স্কুলে পড়ে। শান্তি আমাদের থিয়েটারে গান-বাজনা শেখায়।

প্রশ্ন : তিনি আজ আসেননি ?

উত্তর : না। নতুন নাটকের যখন মহড়া আরম্ভ হয় তখন সে আসে, নাচ-গান শেখায় ; নাটক একবার চালু হলে তার কাজ থাকে না, তখন আর বড় একটা আসে না। বাড়িতে একটা নাচ-গানের কোচিং ক্লাস খুলেছে, তাইতে শেখায়।

প্রশ্ন : আপনি থিয়েটারে যোগ দেবার আগে কোনো কাজ করতেন কি ?

উত্তর : হ্যাঁ, আমি মুষ্টিযোদ্ধা ছিলাম। একবার ভারতের মিড্‌ল-ওয়েট চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলাম। একটি জিম্‌নেসিয়ামে বক্সিং শেখাতাম। কিন্তু থিয়েটারের শখ বরাবরই ছিল, একটা সুযোগ পেয়ে চলে এলাম।

প্রশ্ন : আজ স্টেজের ওপর বিশু পালের সঙ্গে আপনার মল্লযুদ্ধ হয়েছিল ; তখন আপনি বিশু পালের শরীরে কোনো দুর্বলতা লক্ষ্য করেছিলেন ?

উত্তর : না। ঠিক অন্য দিনের মত।

প্রশ্ন : কখন জানতে পারলেন বিশু পালের মৃত্যু হয়েছে ?

উত্তর : আমি জানতে পারিনি। লাইট অফ্ হয়ে যাবার পর আমি আর সুলোচনা পিছন দিকের দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম, আলো জ্বললে স্টেজে এসে অ্যাক্টিং আরম্ভ করলাম। এই সময় বিশুর মাটি থেকে উঠে আমার পিঠে ছুরি মারবার কথা ; কিন্তু বিশু উঠল না। তারপরই সুলোচনা চীৎকার করে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তখন আমি বুঝতে পারলাম।

প্রশ্ন : এর বেশি আপনি কিছু জানেন না ? আচ্ছা, আজ আপনি বাড়ি যান। যদি নতুন কিছু মনে পড়ে জানাবেন।

সুলোচনা। বয়স—৩৫। জীবিকা—নাট্যাভিনয়। ঠিকানা—* * শ্যামবাজার, উত্তর কলিকাতা।

সুলোচনা মুখের রঙ অনেকটা পরিষ্কার করেছে, তবু কানে ও গলায় কিছু পেন্ট লেগে আছে। তার গায়ের রঙ ফরসা, শরীরের গড়ন ভাল ; কিন্তু আকস্মিক বিপর্যয়ে একেবারে যেন ভেঙে পড়েছে। অফিস ঘরে এসে মাধব মিত্রের সামনের চেয়ারে সে বসে পড়ল, আর্তস্বরে নিজেই প্রথমে প্রশ্ন করল, 'কে একাজ করল, দারোগাবাবু ?'

উত্তরে দারোগা প্রশ্ন করলেন, 'কোন্ কাজ ?'

সুলোচনার চোখ দারোগার মুখের ওপর স্থির হল, গলার স্বরে তীক্ষ্ণতা এল। সে বলল, 'আপনি জানেন না কোন্ কাজ ? ওঁর শরীরে কোনো রোগ ছিল না, ওঁর মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। কেউ ওঁকে খুন করেছে।'

প্রশ্ন : এ বিষয়ে এখনো ডাক্তারের রিপোর্ট পাওয়া যায়নি, তবে আপনার অনুমান সত্যিও হতে পারে। যদি সত্যি হয়, কে খুন করেছে আপনি বলতে পারেন ?

উত্তর : তা কি করে বলব। কিন্তু ওঁর কোনো শত্রু ছিল না।

প্রশ্ন : শত্রু না থাকলেও বিশু পালের মৃত্যুতে অনেকের লাভ ছিল। যাদের উদ্দেশ্যে উনি লাইফ ইন্সিওর করেছিলেন তাঁর মৃত্যুতে তাদের সকলেরই লাভ। নয় কি ?

উত্তর : তা সত্যি কিন্তু এমন কে আছে কয়েকটা টাকার জন্যে চিরজীবনের উপকারী বন্ধুকে খুন করবে !

প্রশ্ন : আপনি কাউকে সন্দেহ করেন না ?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : বাইরের কেউ হতে পারে না ?

উত্তর : বাইরের লোক ! তা জানি না। তিনি থিয়েটারের বাইরের অনেক লোককে চিনতেন, কার মনে কী আছে কেমন করে জানব ?

প্রশ্ন : আচ্ছা যাক। আপনার সঙ্গে বিশুবাবুর কতদিনের পরিচয় ?

উত্তর : প্রায় পাঁচ বছর।

প্রশ্ন : কোথায় পরিচয় হয়েছিল ? কে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল ?

উত্তর : এই থিয়েটারে পরিচয় হয়েছিল। ব্রজদুলালবাবু আগে থাকতে আমাকে চিনতেন, তিনিই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন : আগেও থিয়েটার করতেন নাকি ?

উত্তর : নিয়মিত নয়, মাঝে মাঝে করতাম।

প্রশ্ন : আপনার পারিবারিক পরিস্থিতি কিছু জানতে চাই।

উত্তর : মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। কম বয়সে বিধবা হয়েছিলুম। থিয়েটারের দিকে ঝোঁক ছিল। সুযোগ পেয়ে চলে এলুম।

প্রশ্ন : এ থিয়েটারে আসার পর থেকে বিশুবাবুর সঙ্গে আছেন ?

উত্তর : হ্যাঁ। বিয়ে হয়নি, কিন্তু উনিই আমার স্বামী।

প্রশ্ন : বাপের বাড়ির সঙ্গে আর আপনার কোনো সম্বন্ধ নেই ?

উত্তর : না। আমার মা বাবা নেই, দাদা খবর রাখেন না।

প্রশ্ন : ডাক্তার অমল পালের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন ?

উত্তর : ভাল। সে তার দাদাকে শ্রদ্ধা করত। বাড়িতে বড় একটা আসত না, দরকার হলে এখানে এসে দাদার সঙ্গে দেখা করত।

প্রশ্ন : কিসের দরকার—টাকার ?

উত্তর : হ্যাঁ। বেশির ভাগই টাকা। ওর ডাক্তারি ভাল চলে না। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে—

প্রশ্ন : বিশু পালের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি এখন কে পাবে আপনি জানেন ?

উত্তর : যতদূর জানি উনি উইল করে যাননি। স্থাবর সম্পত্তির কথাও কখনো শুনিনি। ব্যাঙ্কে কিছু টাকা আছে, আর মোটর গাড়িটা আছে। ব্যাঙ্কের টাকা কে পাবে তা জানি না, তবে গাড়িটা আমার নামে আছে, সম্ভবত আমার নামেই থাকবে।

প্রশ্ন : এবার শেষ প্রশ্ন। আজ অভিনয়ের সময় কিছু দেখেছেন কিম্বা শুনেছেন কি যা আমাদের কাজে লাগতে পারে ?

সুলোচনা একটু চিন্তা করে বলল, 'সন্দেহজনক কিছু নয়, তবে সোমরিয়াকে উইংসের বাইরে এক কোণে লুকিয়ে বসে থাকতে দেখেছি। সে মাঝে মাঝে ভিতরে এসে থিয়েটার দেখে।'

প্রশ্ন : সোমরিয়া কে ?

উত্তর : দারোয়ান প্রভু সিং-এর বোন।

ইন্সপেক্টর : আচ্ছা, আজ এই পর্যন্ত।

মণীশ ভদ্র। বয়স—২৯। জীবিকা—থিয়েটারের আলোকযন্ত্র পরিচালনা। ঠিকানা * * আমহার্স্ট স্ট্রীট।

মণীশ ঘরে ঢুকে একবার কব্জির ঘড়ির দিকে তাকালো। রেডিয়াম লাগানো ঘড়ি, অন্ধকারেও সময় দেখা যায়। সে চেয়ারে বসে বলল, 'পৌনে এগারটা। দারোগাবাবু, বড্ড রাত হয়ে গেছে, একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবেন ? হোটেল সব বন্ধ হয়ে গেছে, আজ আর বোধহয় কিছু জুটবে না—'

মাধববাবু বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার এজাহার পাঁচ মিনিটের বেশি লাগবে না।'

মণীশ বলল, 'আমি একলা নয়, বৌও আছে। —দু'জনের এজাহার একসঙ্গে নিলে হয় না ?'

মাধববাবু বললেন, 'না, তা হয় না। আপনারা দু'জন দু' জায়াগায় ছিলেন। —আচ্ছা, বলুন দেখি, আলো নেভাবার পর আপনি কী করলেন ?'

উত্তর : সুইচের ওপর হাত রেখে ঘড়ির পানে তাকিয়ে রইলাম, পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড পরে সুইচ টিপে আলো জ্বাললাম।

প্রশ্ন : আপনার বোর্ডে অনেকগুলি সুইচ, কোনটা কোথাকার সুইচ সব আপনার নখদর্পণে ?

উত্তর : হ্যাঁ, তবু সাবধান থাকা ভাল, তাই এই দৃশ্যে সুইচে হাত রাখি।

প্রশ্ন : ঠিক পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড কেন ?

উত্তর : বিশুবাবু সময় ধার্য করে দিয়েছিলেন, পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড হাউস অন্ধকার থাকবে।

প্রশ্ন : আপনার একজন সহকারী আছে না ?

উত্তর : আছে। কাঞ্চন সিংহ। সে আমার সঙ্গে সুইচ বোর্ডে ছিল না। তার মাথা ধরেছিল—

প্রশ্ন : তার প্রায়ই মাথা ধরে ?

মণীশ চুপ করে রইল।

প্রশ্ন : সে কোথায় ছিল আপনি জানেন ?

উত্তর : পরে শুনেছি সে অফিস ঘরে ঘুমোচ্ছিল।

প্রশ্ন : কার মুখে শুনলেন ?

উত্তর : তার নিজের মুখে।

প্রশ্ন : ও। বিশুবাবুর সঙ্গে আপনি কতদিন কাজ করছেন ?

উত্তর : প্রায় চার বছর।

প্রশ্ন : আপনার স্ত্রীও ?

উত্তর : না, তখন আমার বিয়ে হয়নি। মালবিকা থিয়েটারে যোগ দিয়েছে বছরখানেক, এই নাটক ধরবার পর থেকে। বিশুবাবু উত্তরার পার্ট করার জন্যে কমবয়সী মেয়ে খুঁজছিলেন : শেষ পর্যন্ত মালবিকাকে রাখেন।

প্রশ্ন : আপনার নামে বিশুবাবু জীবনবীমা করেননি ?

উত্তর : না। আমি বলেছিলাম জীবনবীমা চাই না, মাইনে বাড়িয়ে দিন। তা তিনি জীবনবীমাও করলেন না, মাইনেও বাড়ালেন না। সাতশো টাকা ছিল, সাতশো টাকাই রইল।

প্রশ্ন : তার বদলে বিশ হাজার টাকা দিয়ে একটা স্ট্যাণ্ডার্ড হেরাল্ড গাড়ি কিনে দিলেন ?

উত্তর : গাড়ির একটা ইতিহাস আছে। বিশুবাবু যখন মাইনে বাড়িয়ে দিলেন না তখন আমি বাইরে কাজ খুঁজতে লাগলাম। এই নাটক আরম্ভ হবার কয়েকদিন আগে আমি মাদ্রাজ থেকে একটা ভাল অফার পেলাম। একটা বিখ্যাত সিনেমা কোম্পানি আলোকশিল্পী চায় ; মাইনে দেড় হাজার, তাছাড়া বাড়িভাড়া ইত্যাদি। বিশুবাবুকে গিয়ে চিঠি দেখালাম। তিনি বে-কায়দায় পড়ে গেলেন, কিন্তু তবু নিজের জিদ ছাড়লেন না। আমাকে গাড়ি কিনে দিলেন। আর মালবিকাকে যে একশো টাকা হাতখরচ হিসেবে দিতেন তা বাড়িয়ে দু'শো টাকা করে দিলেন। তখন আমি মাদ্রাজের অফারটা ছেড়ে দিলাম। দেশ ছেড়ে কে বিদেশে যেতে চায় ?

দারোগাবাবু বললেন, 'তা বটে। তাহলে আপনি বিশু পালের মৃত্যু সম্বন্ধে কোনো হদিস দিতে পারেন না ? আচ্ছা, এবার তাহলে আপনার স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিন।'

মালবিকা ভদ্র। বয়স—২০। জীবিকা—নাট্যাভিনয়। ঠিকানা * * আমহার্স্ট স্ট্রীট।

নোট : বিশু পালের আকস্মিক মৃত্যুতে সাক্ষী প্রথমটা খুব শক্ খেয়েছিল, এখন সুস্থ হয়েছে। বয়স কম, দেখতেও সুন্দরী ; কিন্তু চোখের ঋজু দৃষ্টি ও চিবুকের মজবুত গড়ন থেকে চরিত্রের দৃঢ়তা অনুমান করা যায়।

প্রশ্ন : নাটকে আপনি উত্তরার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। নাটকের শেষ দৃশ্য পর্যন্ত আপনার অভিনয় আছে ?

উত্তরা : না। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে আমার অভিনয় শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার স্বামীকে থাকতে হয়, তাই আমিও থাকি।

প্রশ্ন : আজ যখন শেষ অঙ্কে আলো নিভিয়ে দেওয়া হয় তখন আপনি কোথায় ছিলেন ?

উত্তর : সাধারণ অভিনেত্রী মেয়েদের জন্যে একটা আলাদা সাজঘর আছে। আমি সেই সাজঘরে গায়ের মুখের রঙ সবেমাত্র তুলতে আরম্ভ করেছিলুম।

প্রশ্ন : সেখানে আর কেউ ছিল ?

উত্তর : লক্ষ্য করিনি। একবার বোধহয় নন্দিতাদিদি ঘরে এসেছিল।

প্রশ্ন : আপনি কবে থেকে অভিনয় করছেন ?

উত্তর : এই নাটকের আরম্ভ থেকে। প্রায় বছর ঘুরতে চলল।

প্রশ্ন : অভিনয়ের দিকে আপনার ঝোঁক আছে।

উত্তর : খুব বেশি নয়। আমার স্বামী চেয়েছিলেন, কিছু টাকাও আসছিল, তাই থিয়েটারে যোগ দিয়েছিলুম।

প্রশ্ন : আপনি বোম্বাই কিম্বা মাদ্রাজে গিয়ে সিনেমায় অভিনয় করলে অনেক টাকা উপার্জন

করতে পারতেন। করেননি কেন ?

উত্তর : বাংলা দেশের বাইরে যেতে ইচ্ছে করে না। তাছাড়া আমি গেরস্থ ঘরের মেয়ে, ঘরকন্না করতেই ভালবাসি। আমার মা সহমৃতা হয়েছিলেন।

প্রশ্ন : সহমৃতা ! আজকালকার দিনে— !

উত্তর : বাবা মারা যাবার এক ঘন্টা পরে মা হার্টফেল করে মারা যান।

প্রশ্ন : ও—বুঝেছি। আচ্ছা, বিশু পাল কেমন লোক ছিলেন ?

উত্তর : খুব মিশুকে লোক ছিলেন। দরাজ হাত ছিল। সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার করতেন।

প্রশ্ন : মেয়েদের সঙ্গেও ?

উত্তর : হ্যাঁ। কিন্তু কখনো কোনো রকম বেচাল দেখিনি।

ইন্সপেক্টর : আচ্ছা, এবার আপনি বাড়ি যান।

কাঞ্চন সিংহ। বয়স—২৬। জীবিকা—থিয়েটারের আলোকশিল্পীর সহকারী। ঠিকানা—মানিকতলা স্ট্রীটের একটি মেস।

নোট : লোকটির ভাবভঙ্গী একটু খ্যাপাটে গোছের ; মাঝে মাঝে আবোল তাবোল এলোমেলো কথা বলে। কতখানি খাঁটি কতখানি অভিনয় বলা যায় না।

প্রশ্ন : আপনি হিপি, না বিট্‌লে, না অবধূত ?

উত্তর : আজ্ঞে, আমি বাঙালী।

প্রশ্ন : আপনার সাজপোশাক বাঙালীর মত নয়। দাড়ি গোঁফও প্রচুর। কোনো কারণ আছে কি ?

উত্তর : আমার ভাল লাগে। তাছাড়া থিয়েটার করার সময় পরচুলো পরতে হয় না।

প্রশ্ন : আপনি এখানে আসার আগে কী কাজ করতেন ?

উত্তর : বাউণ্ডুলে ছিলাম। বাপ কিছু টাকা রেখে গিয়েছিল, মেসে থাকতাম আর শখের থিয়েটার করতাম।

প্রশ্ন : তাহলে চাকরিতে ঢুকলেন কেন ?

উত্তর : বাপের পয়সায় শাক-চচ্চড়ি খাওয়া চলে, রসগোল্লা খাওয়া চলে না।

প্রশ্ন : তাহলে রসগোল্লা খাওয়ার জন্যেই চাকরিতে ঢুকেছিলেন ?

উত্তর : শুধু রসগোল্লা নয়, অন্য মতলবও ছিল। জানেন, আমি খুব ভাল অ্যাক্ট করতে পারি। শিবাজির পার্ট, ঔরঙ্গজেবের পার্ট প্লে করেছি। বিশুবাবু আমার চেহারা দেখে চাকরিতে নিলেন, কিন্তু কাজ দিলেন আলো জ্বালা আর আলো নেভানোর। যদি অভিনয় করতে দিতেন, আগুন ছুটিয়ে দিতাম।

প্রশ্ন : তা বটে। এখন বলুন দেখি, আলো নেভানোর সময় আপনি সুইচের কাছে ছিলেন না কেন ?

উত্তর : আলো নেভানোর সময় সুইচবোর্ডে একজন লোকেরই দরকার হয়। মণীশদা ছিলেন, তাই আমি—

প্রশ্ন : কোথায় ছিলেন ?

উত্তর : মাথা ধরেছিল, তাই আমি অফিস ঘরে গিয়ে টেবিলে মাথা রেখে একটু বসে ছিলাম।

প্রশ্ন : স্টেজের ওপর খুন হল। অসময়ে প্লে বন্ধ হয়ে গেল, এসব কিছুই জানতে পারেননি ?

উত্তর : এঁ—একটু ঝিমকিনি এসে গিয়েছিল।

প্রশ্ন : আপনি নেশাভাঙ করেন ?

উত্তর : নেশাভাঙ ! নাঃ, পয়সা কোথায় পাব !

প্রশ্ন : কোন্ নেশা করেন ?

উত্তর : এঁ—নেশা করি না—মাঝে মাঝে ভাঙ খাই। মানে—

প্রশ্ন : মানে মারিওয়ানা সিগারেট খান। কে যোগান দেয় ? পান কোথায় ?

উত্তর : যেখানে সেখানে পাওয়া যায়। ঠেলাগাড়িতে পানের দোকানে। আপনার চাই ?

ইন্সপেক্টর : আপনি এখন যেতে পারেন। মেস ছেড়ে কোথাও যাবেন না। কলকাতাতেই থাকবেন।

দাশরথি চক্রবর্তী। বয়স—৪৫। জীবিকা—নাট্যাভিনয়। ঠিকানা—বেহালা।

ভাল মানুষের মত ভাবভঙ্গী, কিন্তু কথা বলার ধরন সোজা নয়। সরলভাবে চোখ মিট্‌মিট্ করে তাকায়, কিন্তু চোখের গভীরে প্রচ্ছন্ন দুষ্টতার ইঙ্গিত। লোকটি কমিক অ্যাক্টর, খোঁচা দিয়ে কথা বলতে পারে। কিন্তু খোঁচা বুঝতে একটু সময় লাগে।

প্রশ্ন : আপনি গোড়া থেকে বিশুবাবুর সঙ্গে ছিলেন ?

উত্তর : ছিলাম। বিশুর সঙ্গে যথেষ্ট সদ্ভাবও ছিল। তাই বুঝতে পারছি না যাবার সময় সে আমাকে এমনভাবে দয়ে মজিয়ে গেল কেন ?

প্রশ্ন : সেটা কি রকম ?

উত্তর : ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে গেছে। এত রাত্রে যদি ট্যাক্সি না পাই, পেটে কিল মেরে এখানেই শুয়ে থাকতে হবে।

ইন্সপেক্টর : আপনি বেহালায় থাকেন তো ? কিছু ভাববেন না, আমি পুলিস ভ্যানে আপনাকে আর আপনার স্ত্রীকে বাড়ি পাঠিয়ে দেব।

দাশরথি : ধন্যবাদ। এবার যত ইচ্ছে হয় প্রশ্ন করুন।

প্রশ্ন : বিশু পালের সঙ্গে আপনার সদ্ভাব ছিল ?

উত্তর : কারুর সঙ্গে আমার অসদ্ভাব নেই। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা যায় না।

প্রশ্ন : বিশু পালের কোনো শত্রু ছিল ?

উত্তর : শত্রুর কথা শুনিনি। তবে কি জানেন, যেখানে মেয়েমানুষ সেখানেই গণ্ডগোল।

প্রশ্ন : তার মানে ? সুলোচনার কথা বলছেন ?

উত্তর : (ক্ষণেক নীরব থাকার পর) সুলোচনা খুব ভাল অভিনয় করে, কিন্তু সে খানদানি অ্যাক্ট্রেস নয়, গেরস্তঘরের মেয়ে। ব্রজদুলাল প্রথম ওকে—মানে—থিয়েটারে নিয়ে আসে। তারপর বিশুর সঙ্গে সুলোচনার জোটপাট হয়ে গেল—

প্রশ্ন : ও—বুঝেছি। তা নিয়ে বিশুবাবুর সঙ্গে ব্রজদুলালবাবুর কোনো মনোমালিন্য হয়নি ?

উত্তর : অমন হেরফের হামেশাই হয়ে থাকে, কেউ গায়ে মাখে না। কে যাবে কেউটে সাপের লেজ মাড়াতে।

প্রশ্ন : হুঁ। অন্য কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিশু পালের ঘনিষ্ঠতা ছিল ?

উত্তর : তা কি করে জানব। কেউ তো ঢাক পিটিয়ে এসব কাজ করে না। অবশ্য থিয়েটারে নানা রকম মেয়ের যাতায়াত আছে, কোন্ অ্যাক্টরের কখন কোন্ মেয়ের ওপর নজর পড়বে কে বলতে পারে। এই যে দারোয়ান প্রভুনারায়ণের একটা বোন আছে—সোমরিয়া, উচকা বয়স, রূপও আছে। সে থিয়েটারে চাকরানীর কাজ করে ; কারুর নজর এড়িয়ে চলা তার স্বভাব নয়। বিশুও সকাল বিকেল নিয়ম করে থিয়েটার তদারক করতে আসত—

প্রশ্ন : অর্থাৎ, সোমরিয়ার সঙ্গে বিশু পালের— ?

উত্তর : ভগবান জানেন। তবে সুযোগ সুবিধে সবই ছিল।

প্রশ্ন : আচ্ছা, ওকথা যাক। —বিশু পালের সঙ্গে বাইরের কোনো লোকের শত্রুতা ছিল ?

উত্তর : এক থিয়েটারের অধিকারীর সঙ্গে অন্য থিয়েটারের অধিকারীর রেষারেষি থাকে। বিশুর থিয়েটার খুব ভাল চলছিল, অনেকের চোখ টাটিয়েছিল। একে যদি শত্রুতা বলেন, বলতে

পারেন।

প্রশ্ন : এবার নিজের কথা বলুন।

উত্তর : নিজের কথা আর কি বলব ? ছেলেবেলা থেকে থিয়েটারে ঢুকেছি, অনেক ঘাটের জল খেয়েছি। স্ত্রীকে নিয়ে বেহালায় থাকি, ছেলেপুলে নেই। বেশি উচ্চাশাও নেই। যেমনভাবে দিন কাটছিল তেমনিভাবে কেটে গেলেই খুশি থাকতাম। কিন্তু বিশু মরে গেল, ওর দল টিকবে কিনা কে জানে। হয়তো ভেঙে যাবে, তখন আবার অন্য দলে গিয়ে ভিড়তে হবে।

প্রশ্ন : আজ দ্বিতীয় অঙ্কে আপনার আর আপনার স্ত্রীর অভিনয় শেষ হয়ে গিয়েছিল, বাড়ি যাননি কেন ?

উত্তর : দ্বিতীয় অঙ্কের পর বাড়ি যাব বলে বেরুচ্ছি, বিশু বলল, 'একটু থেকে যাও, তোমার সঙ্গে কথা আছে। নাটক শেষ হলে বলব।'

প্রশ্ন : কি কথা ?

উত্তর : তা জানি না, বিশু বলেনি।

প্রশ্ন : সেখানে অন্য কেউ উপস্থিত ছিল ?

উত্তর : না, আমরা একলা ছিলাম। বিশুর ড্রেসিংরুমে কথা হয়েছিল।

ইন্সপেক্টর : হুঁ। আজ এই পর্যন্ত। আপনার স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিন।

নন্দিতা চক্রবর্তী। বয়স—৪৪। জীবিকা—নাট্যাভিনয়। ঠিকানা—বেহালা।

নোট : মহিষমর্দিনী চেহারা, দাশরথির চেয়ে মুঠিখানেক মাথায় উঁচু। লালচে চোখ, বড় বড় দাঁত, কিন্তু গলার স্বর মিষ্টি। আচরণ শিষ্ট ও শালীন।

প্রশ্ন : আপনার স্বামী নামকরা কমিক অ্যাক্টর, আপনিও কি কমিক অ্যাক্টিং করেন ?

উত্তর : ও মা, অ্যাক্টিং-এর আমি কি জানি। আগে আমি থিয়েটারের পোশাক আশাকের ইন-চার্জ ছিলুম। একদিন বিশুবাবু আমাকে একটা ছোট পার্টে নামিয়ে দিলেন। সেই থেকে (হেসে) আমার চেহারার মানানসই পার্ট থাকলে আমি করি।

প্রশ্ন : বিশুবাবু কেমন লোক ছিলেন ?

উত্তর : দিল্‌দরিয়া লোক ছিলেন। টাকা তাঁর হাতের ময়লা ছিল, যেমন রোজগার করতেন তেমনি খরচ করতেন। কিন্তু মদ খেতেন না, বদ্‌খেয়ালি ছিল না।

প্রশ্ন : প্রভুনারায়ণের বোনের সঙ্গে কিছু ছিল ?

উত্তর : ওসব বাজে গুজব, আমি বিশ্বাস করি না।

প্রশ্ন : সুলোচনা কেমন মানুষ ?

উত্তর : (একটু থেমে) সুলোচনা ভাল অভিনয় করে, মেয়েও ভাল, কিন্তু মনের কথা কাউকে বলে না। ভারি চাপা প্রকৃতির মেয়ে।

প্রশ্ন : আর মালবিকা ?

উত্তর : মালবিকা ছেলেমানুষ, কিন্তু মনে ছুঁই-ছুঁৎ আছে। ভালভাবে কারুর সঙ্গে মেশে না, একটু দূরত্ব রেখে চলে। তবে মেয়ে ভাল।

প্রশ্ন : আর ওর স্বামী ?

উত্তর : মণীশ ? একটু গম্ভীর প্রকৃতি, কিন্তু ভাল ছেলে। আর ওর কাজের তুলনা নেই, আলো ফেলে নাটকের চেহারা বদলে দিতে পারে। আগে সাঁতারু ছিল, কিন্তু সাঁতারে তো পয়সা নেই, তাই থিয়েটারে ঢুকেছে।

প্রশ্ন : আর ব্রজদুলালবাবু ?

উত্তর : মদ-টদ খান বটে কিন্তু ভারি বিজ্ঞ লোক। এক সময় মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন, এখনো গায়ে অসুরের শক্তি। ওঁর স্ত্রী শান্তিও ভারি গুণের মেয়ে ; নাচতে জানে, গাইতে জানে, গানে সুর দিতে জানে। এখানকার মিউজিক্ মাস্টার।

প্রশ্ন : স্বামী-স্ত্রীতে সদ্ভাব আছে ?

উত্তর : তা আছে বই কি। তবে যে-যার নিজের কাজে থাকে, কেউ কারুর বড় একটা খবর রাখে না।

প্রশ্ন : আজ যখন আলো নেভানো হয় আপনি কোথায় ছিলেন ?

উত্তর : আমার স্বামী আর আমি স্টেজের পিছন দিকে একটা বেঞ্চিতে বসেছিলুম।

ইন্সপেক্টর একজন জমাদারকে ডেকে বললেন, 'ইনি বেহালায় থাকেন। এঁকে আর এঁর স্বামীকে পুলিসের গাড়িতে বাড়ি পৌঁছে দাও।'

কালীকিঙ্কর দাস। বয়স—৪০। জীবিকা—থিয়েটারের প্রমপ্টার। ঠিকানা * * কৈলাস বোস লেন।

অসমাপ্ত

অহর্নিশ

১৮ বছর, সংকলন ২৩, বসন্ত ১৪২০, এপ্রিল ২০১৪

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়-ব্যোমকেশ বক্সী-নারায়ণ সান্যাল

শরদিন্দু-র অসমাপ্ত 'বিশুপাল-বধ'-এর নারায়ণ সান্যাল লিখিত অগ্রন্থিত শেষাংশ

অরুণ সোম ৭৫

সম্মাননা পত্র

স্মরণপত্র

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

বিশ্বকমিক্সের ইতিহাস

কমিক্সের ইতিবৃত্তের প্রথম পর্ব

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর ধারাবাহিক রচনা

অসদুক্তি-হলাহল

প্রথম আলো

আবীর সিংহ-বিশ্বজিৎ রায়-তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখালেখির প্রথম মূল্যায়ন

ধারা ৩৭৭@'সম'সময়

সমকামীচর্চা ও এক সমকামী দেহব্যবসায়ীর সাক্ষাৎকার

এবং অন্যান্য বিভাগ

সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর শেষ কাহিনির উজ্জ্বল উদ্ধার

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসমাপ্ত ব্যোমকেশ-কাহিনির নারায়ণ সান্যাল লিখিত শেষ অংশ

বিশুপাল বধ: উপসংহার (সটিক)

দুষ্প্রাপ্য রচনাটি বিষয়ে অহর্নিশ-এর কৈফিয়ৎ

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মৃত্যুর মাস-ছয়েক আগে 'বিশুপাল বধ' লিখতে আরম্ভ করেন। তিনি মারা যান ১৯৭০-এ ২২ সেপ্টেম্বর। কিন্তু 'ব্যোমকেশ সমগ্র'-এ (আনন্দ পাবলিশার্স) সংকলিত শোভন বসু-কৃত 'ব্যোমকেশের কথা' শীর্ষক রচনায় এই বক্তব্যের পরেই লেখা থাকতে দেখা যায়, ''শরদিন্দুর দিনলিপি মোতাবেক 'বিশুপাল বধ' রচনা শুরু হয়েছিল ওই বছর জুলাই মাস নাগাদ।" এই গল্প শরদিন্দু শেষ করে যেতে পারেননি। কিন্তু নিতান্ত ঘটনাচক্রে এবং শরদিন্দু, তথা অজিত এবং ব্যোমকেশের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবশতঃ গল্পের শেষটি লেখেন আর এক কথাসাহিত্যিক নারায়ণ সান্যাল। গল্পটি সম্পূর্ণ করায় শ্রীসান্যালের অবলম্বন ছিল শরদিন্দুকৃত গল্পের প্রথমাংশ, গল্পটি প্রসঙ্গে শরদিন্দুর কিছু আলগা উক্তি এবং অবশ্যই শ্রীসান্যালের 'আপন মনের মাধুরী'। এই প্রসঙ্গে নারায়ণ সান্যাল তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি, পি. কে. বসু, বার-অ্যাট-ল'র গোয়েন্দা কাহিনিগুলির সংকলন, 'কাঁটায়-কাঁটায়'-এর দ্বিতীয় খণ্ডের 'কৈফিয়ৎ' শীর্ষক মুখবন্ধে যা লিখেছিলেন, তা-হল :

''ব্যোমকেশ বক্সী মশাই তাঁর জীবনের শেষ 'কেস'টার সমাধান করে যেতে পারেননি। শরদিন্দু অমনিবাসের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় লেখকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্রদ্ধেয় প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখেছিলেন : '১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে শরদিন্দুবাবু কলকাতায় এসে মাসখানেক ছিলেন। পুণায় ফিরে গিয়ে তিনি 'বিশুপাল বধ' শুরু করেছিলেন। গল্পটি তিনি শেষ করে যেতে পারেননি। পড়লে মনে হয় প্রায় অর্ধেক লেখা বাকি আছে। উত্তর কলকাতার একটি থিয়েটারের স্টেজে একজন অভিনেতার খুনের রহস্যভেদ করবার চেষ্টা কেবল আরম্ভ হয়েছে। এই গল্পে আমার নামের সঙ্গে মিল, শরদিন্দুবাবু হয়তো বলতেন স্বভাবের সঙ্গেও মিল, একটি চরিত্র আছে। সে ব্যোমকেশকে থিয়েটার দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে এবং প্রসন্নচিত্তে গড়িয়াহাট মার্কেট থেকে সত্যবতীর বাজারের ব্যাগ নিজের হাতে বয়ে নিয়ে আসছে। গল্পটির পাণ্ডুলিপি লেখকের জীবদ্দশায় দেখিনি। তবে তাঁর মুখে শুনেছিলাম তিনি আমার নাম ব্যবহার করেছেন। আমার ক্ষীণ আপত্তি টেঁকেনি। এই গল্পে প্রতুলবাবু নামের ব্যক্তিটিকে পুলিসের জেরায় নাজেহাল হতে হবে। কিন্তু গল্পটি ততদূর এগোয়নি। থিয়েটারের প্রম্পটার কালীকিঙ্কর দাসের জবানবন্দী আরম্ভ হয়েছে মাত্র। থিয়েটারের লোকের জবানবন্দী শেষ হলে অন্য সবার পালা আসত। বঙ্কিমচন্দ্র একটি অসমাপ্ত ভূতের গল্প রেখে গিয়েছিলেন, তার নাম নিশীথ-রাক্ষসীর কাহিনী। গল্পটির সূত্রপাত কেবল আরম্ভ হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর অনেক পরে কোনও মাসিক পত্রিকার সম্পাদক সেটিকে অন্য একজনকে দিয়ে সমাপ্তি ঘটিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। শরদিন্দুবাবুর প্রকাশক সে চেষ্টা করেননি। বোধহয় ভালই করেছেন।'

অগ্রজপ্রতিম মহাপণ্ডিতের সঙ্গে আমি একমত হতে পারিনি। আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছিলাম অসহায় ব্যোমকেশ বক্সী-মশাইকে! কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে শরসজ্জায় শায়িত পিতামহ ভীষ্মের মতো; বরং বলা উচিত 'জকি'র দোষে শেষ-লেংথে হুমড়ি-খেয়ে-পড়া চির-অপরাজেয় রেসের ঘোড়ার মতো। ওদিকে অজিতের চিতা জ্বলছে, এদিকে ব্যোমকেশ সব্যসাচীর শেষাবস্থায়—গাণ্ডীব তুলবার ক্ষমতাও নেই তাঁর, অথচ অসহায় গোয়েন্দার চোখের সামনে যাদবকুলবধূ অপহরণকারীর অট্টহাসি হাসছে বিশুপালের হত্যাকারী। এক রবিবাসরীয় আসরে কথাটা বলেছিলাম শ্রদ্ধেয় প্রতুলবাবুকে। উনি সহাস্যে প্রতিপ্রশ্ন করেছিলেন, আপনি গল্পটা কীভাবে শেষ হত তা আন্দাজ করতে পারেন?

জবাব দিইনি। অর্থাৎ দিয়েছিলাম—লিখিত জবাব—পরের অধিবেশনে। পরে বিশুপাল বধের শেষাংশটি উনি আমাকে প্রত্যার্পণ করে সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। প্রতুলবাবুর সবকয়টি শর্তই শেষাংশে মানা হয়েছিল—অজিতের গাড়ি হয়েছিল..। 'প্রতুল' নামধারী ভালমানুষ অধ্যাপকটিকে অহেতুক পুলিসের জেরায় পড়তে হয়। আর অন্তিমে বিশুপালের হত্যাকারীর হাতে হাতকড়া পড়ে।

ঘটনাচক্রে একথা বন্ধুবর সমরেশ বসুর কর্ণগোচর হয়। সে আমার কাছ থেকে পাণ্ডুলিপিটি সংগ্রহ করে। সমরেশ তখন 'মহানগর' পত্রিকার সম্পাদক। পূজাসংখ্যায় 'বিশুপাল বধ: উপসংহার' নামে কাহিনীর শেষাংশটি ছাপা হয়।"

নারায়ণ সান্যালের সাহিত্য-জীবনের প্রথমদিকের কিছু সৃষ্টিতে যে শরদিন্দুর বিশেষ প্রভাব পড়েছিল তা বোঝা যায় তাঁর লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে ব্যবহৃত ভাষায়। অ্যান্থনি হোপের 'দ্য প্রিজনার অব জেন্দা' যেভাবে শরদিন্দুর কলমে কালজয়ী উপন্যাস 'ঝিন্দের বন্দী'তে পরিণত হয়েছিল, ঠিক সেইভাবে নারায়ণ সান্যাল 'থ্রি-মাস্কেটিয়ার্স'-কে পরিণত করতে চেয়েছিলেন 'মহাকালের মন্দির'-এ। এই রচনাকে তাই শরদিন্দুর প্রতি ভক্ত হিসেবে নারায়ণ সান্যালের শ্রদ্ধাঞ্জলি মনে করা যায়। 'বিশুপাল বধ: উপসংহার' যে সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল সেটি বর্তমানে অলভ্য এবং দুষ্প্রাপ্য। বিভিন্ন কারণে কোনো গ্রন্থেও লেখাটি সংকলিত হতে পারেনি। নারায়ণ সান্যালের পরিবারবর্গ অহর্নিশ-এ লেখাটি পুনঃপ্রকাশের অনুমতি দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। আমরা 'বিশুপাল বধ: উপসংহার' অহর্নিশ-এ প্রকাশ করলাম পাণ্ডুলিপির বানান অপরিবর্তিত রেখে এবং শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যোমকেশ বক্সী, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নারায়ণ সান্যালের উদ্দেশ্যে নিবেদিত শ্রদ্ধার্ঘ্য-স্বরূপ।

বিশুপাল বধ: উপসংহার

লেখকের কৈফিয়ৎ

'বিশুপাল বধ' শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ অসমাপ্ত গোয়েন্দাকাহিনী[১]। আনন্দ পাবলিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত 'শরদিন্দু অম্নিবাস'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে এই অসমাপ্ত কাহিনীটি প্রকাশিত। বিশ্রুতকীর্তি গোয়েন্দাকুলতিলক ব্যোমকেশ বক্সীমশায়ের এটাই শেষ সত্যান্বেষণ প্রচেষ্টা। কাহিনী যেহেতু অসমাপ্ত তাই অপরাধী ধরা পড়েনি। ১৯৭০ সালে মার্চ মাসে লেখা শুরু হয় এবং ঐ বছর ২২ সেপ্টেম্বর মানসপুত্রকে অকূলে ভাসিয়ে শরদিন্দু মহাপ্রয়াণ করেন। চির অপরাজেয় ব্যোমকেশ তাই হয়ে গেল চলচ্ছক্তিহীন—হিচককের 'রিয়ার উইন্ডো'[২]-র নায়কের চেয়েও অসহায়।

শরদিন্দু অম্নিবাস-এর ভূমিকায় পরমশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত মশাই লিখেছেন, "১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে শরদিন্দু ক'লকাতায় এসে মাসখানেক ছিলেন। পুণায় ফিরে গিয়ে তিনি 'বিশুপাল বধ' শুরু করেছিলেন। গল্পটি তিনি শেষ করে যেতে পারেননি। পড়লে মনে হয় প্রায় অর্ধেক লেখা বাকি আছে। উত্তর কলকাতার একটি থিয়েটারের স্টেজে একজন অভিনেতার খুনের রহস্যভেদ করবার চেষ্টা কেবলমাত্র আরম্ভ হয়েছে। এই গল্পে আমার নামের সঙ্গে মিল, শরদিন্দুবাবু হয়তো বলতেন স্বভাবের সঙ্গেও মিল, একটি চরিত্র আছে। সে ব্যোমকেশকে থিয়েটার দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে এবং প্রসন্নচিত্তে গড়িয়াহাট মার্কেট থেকে সত্যবতীর বাজারের ব্যাগ নিজের হাতে বয়ে নিয়ে আসছে। গল্পটির পাণ্ডুলিপি লেখকের জীবদ্দশায় দেখিনি। তবে তাঁর মুখে শুনেছিলাম তিনি আমার নাম ব্যবহার করেছেন। আমার ক্ষীণ আপত্তি টেঁকেনি। এগল্পের ঘটনা বা দুর্ঘটনার অবশ্যম্ভাবী ফল সত্যবতীর মোটর গাড়ি প্রাপ্তি সে সম্বন্ধেও আভাস পাওয়া গিয়েছিল। শরদিন্দুবাবু আমাকে শাসিয়ে রেখেছিলেন গল্পটিতে প্রতুলবাবু নামের ব্যক্তিটিকে পুলিসের জেরায় নাজেহাল হতে হবে। কিন্তু গল্পটি ততদূর এগোয়নি। থিয়েটারের প্রম্পটার কালীকিঙ্কর দাসের জবানবন্দী আরম্ভ হয়েছে মাত্র। থিয়েটারের লোকের জবানবন্দী শেষ হলে অন্য সবার পালা আসত। বঙ্কিমচন্দ্র একটি অসমাপ্ত ভূতের গল্প রেখে গিয়েছিলেন। তার নাম নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী। গল্পটির সূত্রপাত কেবল আরম্ভ হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর অনেক পরে কোনও মাসিক পত্রিকার সম্পাদক সেটিকে অন্য একজনকে দিয়ে সমাপ্তি ঘটিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। শরদিন্দুবাবুর প্রকাশক সে চেষ্টা করেননি। বোধহয় ভালই করেছেন।

একটি বিষয় হয়তো লক্ষ্য করবার আছে। তাঁর পরিচিতরা জানতেন শরদিন্দুবাবুর ফলিত জ্যোতিষে অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি বারে বারে বলেছেন, ব্যোমকেশের কোষ্ঠী দেখেছি, ওর গাড়ি কেনার সম্ভাবনা নেই। আমাদের উপরোধে অবশেষে গাড়ি দিতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু গল্পটি শেষ হয়নি। সত্যবতীর বরাতেও শেষ পর্যন্ত গাড়ি হল না। ফলিত জ্যোতিষে তাঁর গণনা কি রকম অভ্রান্ত হয়, শরদিন্দুবাবু বোধহয় তার প্রমাণ রেখে গেলেন।' (৩রা আশ্বিন, ১৩৭৮)[৩]

চির অপরাজেয় সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী নিয়তির নির্দেশে এভাবে হার মানতে বাধ্য হবে, এটা আমার বরদাস্ত হয়নি। পণ্ডিতাগ্রগণ্য ভূমিকাকারের সঙ্গে তাই খুশী মনে একমত হতে পারলাম না। একথা অনস্বীকার্য যে, শরদিন্দুর অননুকরণীয় রচনাশৈলী, তার brevity is the soul of wit মন্ত্রের বিচিত্র প্রয়োগ কৌশল, তাঁর গোয়েন্দাগল্পের সাস্পেন্স অপরের কলমে কোনদিনই ধরা দেবে না। কিন্তু শুধু সে-জন্য চির-অপরাজেয় ব্যোমকেশ তার 'কেরিয়ার'-এর এই শেষ লেংথে এমন মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে চিরটাকাল? বঙ্কিমের অসমাপ্ত 'ভূতের গল্প' চিরকাল অসমাপ্ত থাকলেও কোন ক্ষতি ছিল না; কারণ ভূতের গল্পের যেটা 'শেষপ্রশ্ন' তার 'শেষউত্তর' নেই! কিন্তু গোয়েন্দাগল্পে? বিশুপালের হত্যাকারী দৈবের সহায়তায় যদি ধরা না পড়ে তবে বাঙলাভাষার পাঠকসমাজ কি ব্যোমকেশকে ছুটি দিতে পারে? না, ব্যোমকেশই ছুটি চাইতে পারে?

১। অসমাপ্ত গোয়েন্দাকাহিনী : জুলাই, ১৯৭০ সালে লেখা শুরু করেন শরদিন্দু। বিশুপাল বধ গল্পটি শরদিন্দুর মৃত্যুর জন্য অসমাপ্তই থেকে যায়। গল্পের সময়কালের কোনো তথ্যসূত্র শরদিন্দু দেন নি। তবে ১৯.১১.১৯৬৮-র 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র পৃষ্ঠা ৩-এ রঙ্গমঞ্চেই একজন অভিনেতার অভিনয় করতে করতে অসুস্থ হয়ে মারা যাবার খবর ছাপা হয়। আবার ১৪.০২.১৯৬৯-র আনন্দবাজার পত্রিকা (পৃ. ১২) জানাচ্ছে, এলিট মুভিজের পক্ষ থেকে চিদানন্দ দাশগুপ্ত একটি পৌরাণিক ছবি পরিচালনা করবেন। ব্যোমকেশ গবেষক অনামিকা দাসের অনুমান মহাভারতের বিরাট পর্ব থেকে অপুপ্রাণিত এই চিত্রনাট্যটি ও পূর্বের খবর হয়তো শরদিন্দুকে 'বিশুপাল বধ' লিখতে প্রেরণা দেয়। 'বিশুপাল বধ'-এ ব্যোমকেশরা 'কীচক বধ' নাটক দেখতে যায়। শরদিন্দু লিখছেন, 'গল্পটি মহাভারতের বিরাট পর্ব থেকে অপহৃত হলেও একেবারে মাছিমারা অনুকরণ নয়, যথেষ্ট মৌলিকতা আছে। নাটক চলাকালীন স্টেজেই খুন হন বিশুপাল। সুতরাং ঘটনাকাল ১৯৬৮ বা ১৯৬৯। তবে নারায়ণ সান্যাল স্পষ্টতই কাহিনিকে ১৯৭০-এ স্থাপন করেছেন। গল্পটি কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। প্রতুল চন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত শরদিন্দু অমনিবাস (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৭৮, অগাস্ট ১৯৭১-এ [পৃ. (৪)+৭+(১)+৬৮৮] সরাসরি অন্তর্ভুক্ত এবং প্রথম মুদ্রিত। অনামিকা দাসের 'ব্যোমকেশের জীবন পঞ্জি', অশোকনগর সাহিত্য পত্রিকা (সম্পাদক : অভিষেক চক্রবর্তী ও রুদ্রদীপ চন্দরায়), প্রথম বর্ষ, প্রথম সংকলন, শীত ১৪২০ (পৃ. ২১৭) দ্রষ্টব্য।

২। রিয়ার উইন্ডো : ১ আগস্ট, ১৯৫৪ সালে মুক্তি প্রাপ্ত আলফ্রেড হিচ্‌কক পরিচালিত বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্র। এর নায়ক এক ফটোগ্রাফার এল. বি. জেফ্রি। পা ভেঙে যাওয়ায় গৃহবন্দি। ফলে সে দূরবীন দিয়ে জানলায় বাইরের পৃথিবীকে দেখে। কর্নেল উলরিচের 'It had to be

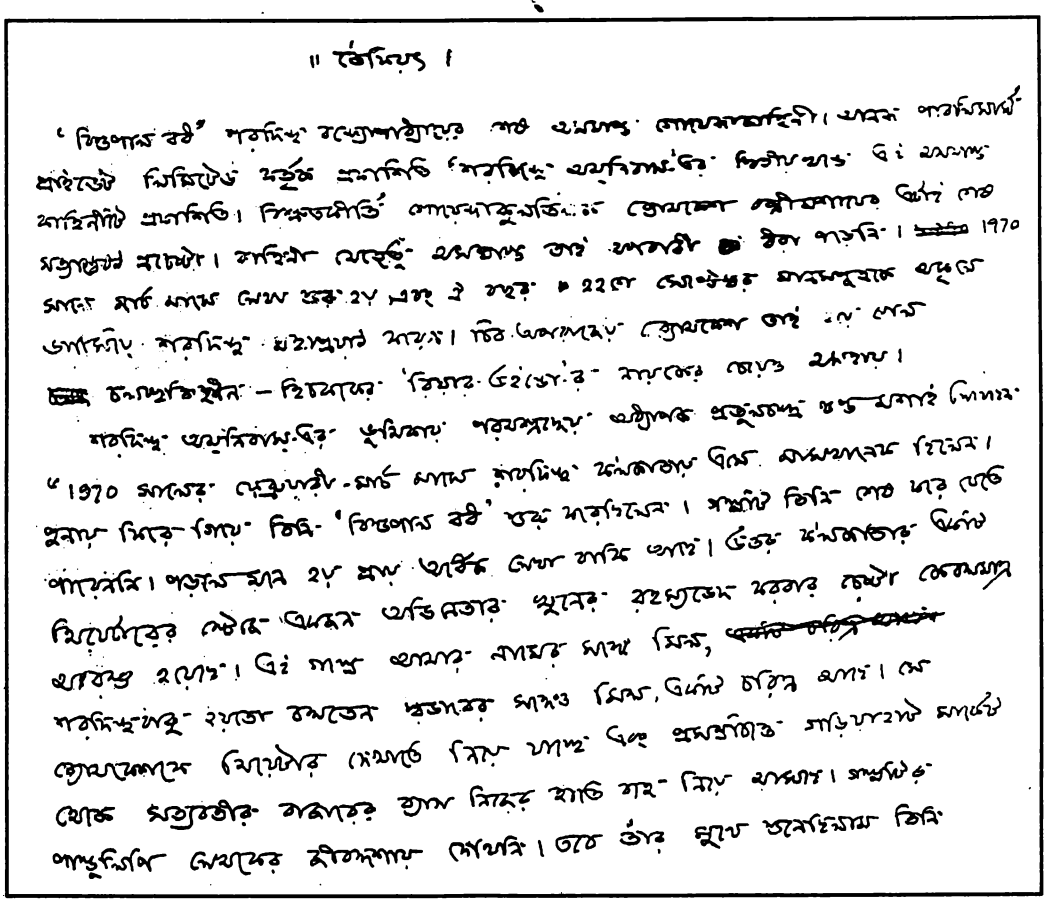

গোয়েন্দাগল্প সার্থক হওয়ার অন্যতম প্রধান সর্তটি হচ্ছে এই যে লেখক তাঁর 'ভাইটাল-ক্লু'টিকে অর্থাৎ সমস্যাসন্ধানের মূলসূত্রটিকে এমন সুকৌশলে পাঠকের সামনে মেলে ধরবেন যে, পাঠক তা দেখবে, কিন্তু নজর করবে না। গল্প শেষ হলে পাঠক যখন বলে ওঠে : 'ঈশ্! এমন সহজ সূত্রটা নজরে পড়েনি!' — তখনই গোয়েন্দা গল্প সার্থক! 'বিশুপাল বধে' নজর হল — এমন কয়েকটি সূত্র তিনি অতি সুকৌশলে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ ছাড়া গল্পটিকে শরদিন্দুবাবু যে কোনদিকে মোড় ফেরাতেন সে বিষয়ে লেখকের অন্তরঙ্গ বন্ধু ভূমিকায় কয়েকটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রেখে গেছেন। বলেছেন, 'প্রতুলবাবু নামের অধ্যাপকটিকে পুলিসের জেরায় নাজেহাল হতে হবে', বলেছেন, 'গল্পের শেষে সত্যবতীর এতদিনের সাধ মিটত, অর্থাৎ গাড়ি হত', অথচ আবার বলছেন 'কোষ্ঠীর ফলাফলে সত্যবতী- ব্যোমকেশের ভাগ্যে গাড়ি-চড়ার সৌভাগ্য নেই।'

শরদিন্দুবাবুর এই এতগুলি প্রতিশ্রুতিকেও মিটিয়ে দেবার দায় তাঁর উত্তরসাধকের।

একটা কথা। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় কৈশোরকাল থেকে আমার অত্যন্ত প্রিয় শ্রদ্ধাভাজন কাহিনীকার। গল্পটি শেষ করতে হলে তাঁর অননুকরণীয় ভাষাতেই করতে হবে। তা প্রায় অসম্ভব। তাঁর রচনাশৈলী ও টেকনিক আমি বারে বারে অনুকরণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি! আমার 'মহাকালের মন্দির' যে 'ঝিন্দের বন্দী'র টেকনিকে বিদেশী কাহিনীর দেশী রূপান্তর তা সেই গ্রন্থের ভূমিকাতেই স্বীকার করেছি। 'অজন্তা অপরূপা'য় আমি বারে বারে 'কালের মন্দিরা' অথবা 'গৌড়মল্লারের' ভাষা অনুকরণের চেষ্টা করেছি। আমার 'কাঁটা সিরিজে'র প্রথম কাহিনী 'সোনার কাঁটা' উৎসর্গ করা হয়েছে সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী মশাইকে। সে গ্রন্থের ভূমিকায় আমি বলেছিলাম "ব্যোমকেশ চিরতরে অবসর নিয়েছেন। অজিতবাবুর কলম আজ স্তব্ধ। বাঙলা সাহিত্যের একটা দিক ফাঁকা হয়ে গেল। সেই গুরুতর অভাবটা পূরণ করতে লব্ধ প্রতিষ্ঠ শক্তিমান কোনও সাহিত্যিক অগ্রসর হয়ে আসছেন না। ...ফলে এই অক্ষম প্রচেষ্টা — 'পি. কে. বাসু' সিরিজের[৪] অবতারণা।"

তাই এই দুঃসাহস!

3.11.1972

Murder' অবলম্বনে তৈরি এই থ্রিলারটি হিচককের সেরা কাজগুলোর মধ্যে একটি।

৩। ৩ আশ্বিন, ১৩৭৮ : মূল প্রবন্ধের নাম 'ব্যোমকেশ, সত্যবতী, সত্যবতীর গাড়ি'। এটি শরদিন্দু অমনিবাস (দ্বিতীয় খণ্ড)-র ভূমিকা হিসেবে লেখা হয়েছিল।

৪। পি. কে. বাসু সিরিজের : পেরিম্যাসন আর এরক্যুল পয়রোর সম্মিলনে সৃষ্ট এই গোয়েন্দা চরিত্রটি পেশায় ব্যারিস্টার। 'নাগচম্পা' উপন্যাস দিয়ে এর যাত্রা শুরু হলেও স্বয়ং নারায়ণ সান্যাল সেটিকে 'ট্রায়াল বল — এলেবেলে খেলা' আখ্যা দিয়েছেন। সেই অর্থে সিরিজের প্রথম কাহিনি 'সোনার কাঁটা' (রচনাকাল-১৯৭৪, প্রথম প্রকাশ – অক্টোবর, ১৯৭৪, উৎসর্গ — 'ব্যোমকেশ বক্সী')। সিরিজের প্রতিটি কাহিনিতে 'কাঁটা' শব্দটি শিরোনামে থাকায় এটি 'কাঁটা সিরিজ' নামেও খ্যাত। ২০০১ সালে 'হরিপদ কেরানীর কাঁটা' তার জীবৎকালে শেষ মুদ্রিত কাঁটা গ্রন্থ। এই সিরিজের সর্বমোট কাহিনিসংখ্যা আটাশ।

সারমর্ম সংকলন

বিশুপাল বধ: উপসংহার

শরদিন্দু-লিখিত 'বিশুপাল বধ'-এর চুম্বকসার

''কালীচরণ দাসকে পাড়ার লোক আড়ালে শালীচরণ দাস বলে উল্লেখ করত।'' কারণ স্ত্রীবিয়োগের পর কালীচরণ তার দুর-সম্পর্কের শালী মালতীকে নিয়ে এসে নিজের কাছে রাখে। প্রতিবেশীদের বিশ্বাস তাদের একটি অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একদিন জনৈক প্রতিবেশী বিশুপালকে শালীর শয়নকক্ষে আবিষ্কার করে কালীচরণ তাকে মেরে তাড়ায় আর উত্তেজনাবশে শালীকে গলা টিপে মেরে ফেলে। হত্যাপরাধে শালীচরণের চৌদ্দ বছরের মেয়াদ হল। ''শান্তভাবে শালীচরণ জেলে গেল। জেলে যাবার আগে ব্যবস্থা করে গেল : তার বাড়ির দোতলার ভাড়া সলিসিটার আদায় করে ব্যাঙ্কে রাখবেন।'' বিশুপালের অভিনয় ক্ষমতা ছিল। কালে সে একটি 'থিয়েটার হল'-এর মালিক হয়ে একটি নাট্যদল গঠন করে। অধ্যাপক প্রতুলচন্দ্র তাঁর বন্ধু ব্যোমকেশকে নিয়ে একদিন বিশুর দলের 'কীচকবধ' নাটক দেখতে গেলেন। নাটকের শেষ দৃশ্যে ভীম ও কীচকের একটি মল্লযুদ্ধের উপস্থাপনার ব্যবস্থা ছিল। ওদিকে এতদিনে কালীচরণ মেয়াদ-অন্তে মুক্তি পেয়ে ফিরে এসেছে। সে সোজা নবদ্বীপে চলে যায়। সেখানে মাথা মুড়িয়ে কণ্ঠিধারণ করে মালা জপ করতে করতে বাড়িতে ফিরে আসে। বিশুপালের নাটকদলে ছিল : (i) ব্রজদুলাল, বয়স ৪১, বিবাহিত। ভীমের চরিত্রাভিনেতা। (ii) সুলোচনা, বয়স ৩৫, দ্রৌপদী চরিত্রে অভিনেত্রী। বিশুর সঙ্গে সে স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করত। তাকে ব্রজদুলাল থিয়েটারে নিয়ে আসে। (iii) দাশরথি চক্রবর্তী, বয়স ৪৫, কমিক অভিনেতা। (iv) নন্দিতা, বয়স ৪৪, দাশরথির স্ত্রী। 'মহিষমর্দিনী চেহারা'। (v) মণীশ ভদ্র, বয়স ২৯, আলোকশিল্পী। কিছুদিন পূর্বে মাদ্রাজ থেকে ভাল অফার পেয়ে চাকরি ছেড়ে দিতে চায়। বিশুপাল একটি মটোর গাড়ি কিনে দিয়ে তাকে আটকায়। (vi) মালবিকা, বয়স ২০, মণীশের স্ত্রী। জীবিকা—নাট্যাভিনয়। (vii) কাঞ্চন সিংহ, বয়স ২৬, মণীশের সহকারী। ''লোকটির ভাবভঙ্গি একটু খ্যাপাটে গোছের; মাঝে মাঝে আবোল তাবোল এলোমেলো কথা বলে।'' (viii) প্রভুনারায়ণ সিং — দ্বারোয়ান। (ix) মোমরিয়া, প্রভুর যুবতী ভগিনী। স্বামীত্যক্তা। প্রভুর সংসারে থাকে। (x) অমল পাল — বিশুর ছোটভাই, পেশায় ডাক্তার। পশার ভালো নয়। বস্তুত দাদার মুখাপেক্ষী। (xi) কালীকিঙ্কর দাস, বয়স ৪০। জীবিকা—থিয়েটারের প্রম্পটার। (সম্প্রতি দলে এসেছে)।

হত্যাটা ঘটেছিল সর্বসমক্ষে, স্টেজের উপর, অভিনয়ের শেষদৃশ্যে যখন ভীম ও কীচকের মল্লযুদ্ধ হচ্ছে। নাটকের নির্দেশমত মণীশ স্টেজ সম্পূর্ণ অন্ধকার করে দেয় এবং নির্ধারিত পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড পরে আলো জ্বেলে দেয়। নাটকের নির্দেশমত তখন কিন্তু বিশুপাল অলক্ষিতে উঠে দাঁড়ায় না। দেখা যায় সর্বসমক্ষেই, কিন্তু নীরন্ধ্র অন্ধকারে বিশুপাল মারা গেছে। তদন্তে দেখা যায়, মৃতের মুখে একটি কাচের এ্যাম্পুলের ভাঙা অংশ। ময়না তদন্তে মুখবিহ্বরে 'হাইড্রোসায়ানিক' বিষের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। বস্তুত শরদিন্দুবাবু একটি অনুচ্ছেদে দেখিয়েছেন অজ্ঞাতনামা হত্যাকারী গোলদিঘিতে একজন অজ্ঞাতনামা সহকারীর কাছ থেকে ঐ এ্যাম্পুলটি গ্রহণ করেছে। অন্ধকারের ভিতর কে, কীভাবে সেটা ভূতলশায়িত বিশুপালের মুখের ভিতর ফেলে দেয় তা জানা যায় না। প্রত্যাশিতভাবে মৃতের খুব কাছাকাছি ছিল ব্রজকিশোর, সুলোচনা, মণীশ। প্রভুনারায়ণ ছিল গেটে; নিজ স্বীকারোক্তি মতে কাঞ্চন ছিল গ্রীণরুমে, নিদ্রাগত। অমল পাল স্টেজে না থাকাই সম্ভব। প্রতুলবাবু বলেন, তিনি নাকি অন্ধকারের মধ্যে চুড়ির ঝনৎকার শুনতে পেয়েছিলেন। তদন্তে আরও জানা গেল, বিশুপাল প্রায় সকলের নামেই মোটা অঙ্কের ইন্সিওর করেছেন; অর্থাৎ নিজ-জীবন ইন্সিওর করে ওদের 'নমিনি' করেছেন। যথা : ব্রজকিশোর, দাসরথি প্রভৃতি। মণীশ, কাঞ্চন বা কালীকিঙ্করের নামে অবশ্য ইন্সিওর ছিল না। বিশুপালের উইল আছে কিনা তা সুলোচনা নাকি জানত না, তবে গাড়িটা তারই নামে রেজিস্ট্রি করা। সম্ভবত, অমল পালই ওয়ারিশ।

ব্যোমকেশ তদন্ত শুরু করেছিল সবেমাত্র। বিশুপালের অতীত জীবনে শালীচরণই একমাত্র শত্রু জানতে পেরে ব্যোমকেশ তার খোঁজ নিতে যায়। গিয়ে দেখে শালীচরণ অনুপস্থিত। তার ভাড়াটিয়া দ্বিতলবাসী, বিনয়বাবু জানালেন, শালীচরণ বোষ্টমীকে নিয়ে বৃন্দাবনে গেছেন। বোষ্টমীর পরিচয় দিতে জানালেন, 'আমার বাসায় একটি কমবয়সী ঝি কাজ করত, বোধহয় বিধবা। কাজকর্ম ভালই করছিল, তারপর কালীচরণবাবু জেল থেকে ফিরে এলেন। একলামানুষ হলেও তাঁর একজন ঝি দরকার, চপলা — মানে আমার ঝি তাঁর কাজও করতে লাগল। কিছুদিন যেতে না যেতেই চপলা আমার কাজ ছেড়ে দিল, কেবল কালীচরণবাবুর কাজ করে। তারপর দেখলাম চপলা গলায় কণ্ঠি পরে বৈষ্ণবী হয়েছে। দিন দশেক আগে ... এক থালা মালপো আর পরমান্ন নিয়ে কালীবাবু দোতলায় এলেন, সলজ্জভাবে জানালেন চপলা বোষ্টমীকে তিনি কণ্ঠি বদল করে বিয়ে করেছেন।' প্রতুলবাবুর মতে কালীচরণের স-বোষ্টমী বৃন্দাবন ভ্রমণের ব্যাখ্যা : 'বৈষ্ণবীয় হনিমুন।'

কাহিনীর শেষদিকে দেখি তদন্তকারী পুলিশ অফিসার মাধববাবু এসেছেন প্রতুলবাবুর বাড়িতে। ব্যোমকেশও উপস্থিত। মাধববাবু তাঁর ফাইলটি ব্যোমকেশকে পড়তে দিলেন। সাক্ষীদের প্রাথমিক জবানবন্দী। পর্যায়ক্রমে : অমল পাল, ব্রজদুলাল ঘোষ, সুলোচনা, মণীশ, মালবিকা, কাঞ্চন, দাসরথি, নন্দিতা — এই আটজনের জবানবন্দী পড়া শেষ করেছিল ব্যোমকেশ। অষ্টম জবানবন্দীর মাত্র দুটি পংক্তি শেষ হয়েছিল। ''কালীকিঙ্কর দাস। বয়স ৪০। জীবিকা থিয়েটারের প্রম্পটার। ঠিকানা * * কৈলাস বোস লেন।' — এখানেই বাধ্যতামূলক যবনিকা।)

॥ [illegible] বই : [illegible] ॥

[[illegible] '[illegible] বই'-এর [illegible] :

"[illegible]" [illegible]

[illegible] (i) [illegible], বয়স ৪২, [illegible]। [illegible] (ii) [illegible], বয়স ৫৫; [illegible]। [illegible] (iii) [illegible] চক্রবর্তী, বয়স ৪৫, [illegible] (iv) [illegible], বয়স ৪৪; [illegible] (v) [illegible], বয়স ২৭; [illegible]। [illegible] (vi) [illegible], বয়স ২০; [illegible]। [illegible] (vii) [illegible], বয়স-২৬; [illegible]। [illegible]

"[illegible]" [illegible] (viii) [illegible]। (ix) [illegible] (x) [illegible] — [illegible]। (xi) [illegible], বয়স-৪০। [illegible]।

[illegible] নাটকের নির্দেশক [illegible]

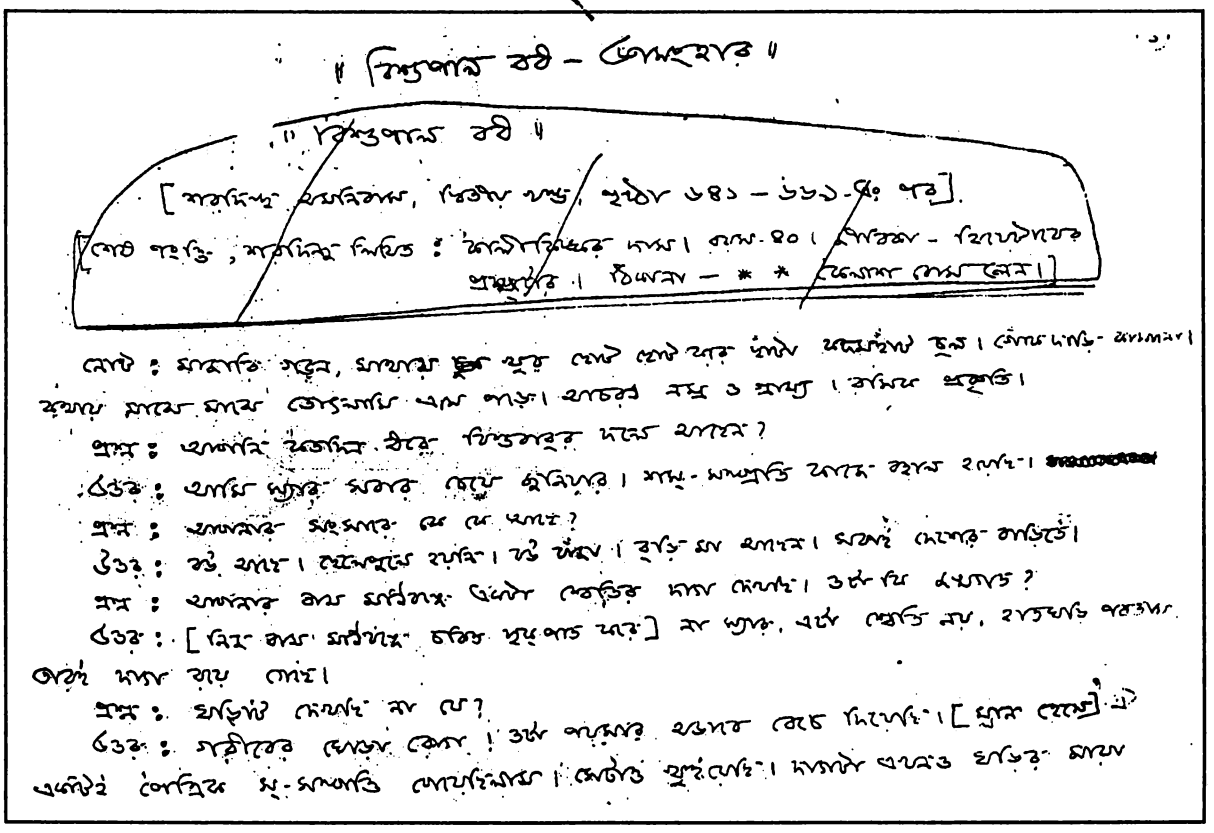

বিশুপাল বধ: উপসংহার

নোট : মাঝারি গড়ন, মাথায় খুব ছোট ছোট করে ছাঁটা কদমছাঁট চুল। গোঁফদাড়ি কামানো। কথায় মাঝে মাঝে তোৎলামি এসে পড়ে। আচরণ নম্র ও গ্রাম্য। রসিক প্রকৃতি।

প্রশ্ন : আপনি কতদিন ধরে বিশুবাবুর দলে আছেন?

উত্তর : আমি স্যার সবার চেয়ে জুনিয়ার। সম্-সম্প্রতি কাজে বহাল হয়েছি।

প্রশ্ন : আপনার সংসারে কে কে আছে?

উত্তর : বউ আছে। ছেলেপুলে হয়নি। বউ বাঁজা। বুড়ি মা আছেন। সবাই দেশের বাড়িতে।

প্রশ্ন : আপনার বাম মণিবন্ধে একটা শ্বেতির দাগ দেখছি। ওটা কি জন্মগত?

উত্তর : (নিজ বাম মণিবন্ধে চকিত দৃক্‌পাত করে) না স্যার, এটা শ্বেতি নয়, হাতঘড়ি পরতাম, তারই দাগ রয়ে গেছে।

প্রশ্ন : ঘড়িটি দেখছি না যে?

উত্তর : গরীবের ঘোড়া রোগ! ওটা পয়সার অভাবে বেচে দিয়েছি। (ম্লান হেসে) ঐ একটিই পৈত্রিক স্-সম্পত্তি পেয়েছিলাম। সেটাও খুইয়েছি। দাগটা এখনও ঘড়ির মায়া ভুলতে পারেনি।

প্রশ্ন : বিশুবাবুর সঙ্গে কোথায় কেমন করে আপনার আলাপ হয়েছিল?

উত্তর : এখানে চাকরি পাওয়ার আগে ভীষণ অভাবে পড়েছিলাম। প্রথমে ঝাঁ-ঝাঁকায় করে ডিম বেচতাম, পরে একটা চায়ের দোকানে বয়-এর কাজ করি। ঐ রেস্টা-টাউরেন্টেই বিশুবাবুর সঙ্গে আলাপ। সেখানেই একদিন তাঁকে ধরে পড়ি। আমার আবার, বুয়েছেন স্যার, ছে-ছেলেবেলা থেকেই থ্যাটারের বাতিক। দেশে-গাঁয়ে অনেকবার রাজা-গজার পার্টও করেছি। একদিন, বুয়েছেন, একেবারে ওঁর ঠ্যাঙ জড়িয়ে ধরলাম। তা বড়বাবুর দিল্‌টা ছিল দরাজ। ঠাঁই দিলেন চরণে। তবে পার্ট দিচ্ছিলেন না। প্রথমে সীন টানাটনি করতাম, এখন প্র-প্রম্পটারের কাজ করছি।

প্রশ্ন : তোমার তো দেখ্‌ছি মাঝে মাঝে বেশ কথা আটকে যায়। প্রম্‌টিং কর কি করে?

উত্তর : স্টেজে উঠ্‌লে বাধে না স্যার! পেত্যয় না হয়, ওদের শুধোন! আর শুধোবারই বা কি দরকার? এই শুনুন ভাস্কর-পণ্ডিতের[১] ডায়ালগ। দেখুন কো-কোথাও আটকাচ্ছে? —'কী চূর্ণ হবে? মায়ের প্রতিমা চূর্ণ হবে? গোলার আঘাতে চূর্ণ হবে? মা, মা, দনুজদলনীমা —'

১। ভাস্কর পণ্ডিতের : ঐতিহাসিক চরিত্র। নাগপুরের মাহাট্টা রাজা রঘুজী ভোঁসলার দেওয়ান। ইনি বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁ-র সময় রামগড়ের পথে এসে বাংলা আক্রমণ করেন ও জগৎ শেঠকে লুণ্ঠন করে আড়াই কোটি টাকা পান। আলিবর্দি পেশোয়া বালাজী বাজীরাও-এর শরণাপন্ন হলে তার অনুরোধে ভাস্কর পণ্ডিত স্বদেশে ফেরেন (১৭৪২ খ্রি:)। পরবর্তীতে আবার তিনি সসৈন্যে বাংলা আক্রমণ করে অকথ্য অত্যাচার ও লুণ্ঠন চালান। এই নিদারুন অত্যাচারই বাংলায় 'বর্গী হাঙ্গামা' নামে প্রসিদ্ধ। আলিবর্দি ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে এঁটে না উঠতে পেরে গুপ্তঘাতক দিয়ে তাকে হত্যা করান। এখানে ভাস্কর পণ্ডিতের ডায়ালগ থেকে প্রমাণিত বিশুপাল পৌরাণিক ছাড়া ঐতিহাসিক নাটকও করতেন।

ইন্সপেক্টার : আরে থাম, থাম! তোমাকে তোৎলামির পরীক্ষা দিতে হবে না। যা জিজ্ঞাসা করছি, তার জবাব দাও। বিশুবাবু তোমার নামেও ইন্সিওর করেছিলেন?

উত্তর : আজ্ঞে না। আমার তো হালে চাকরি হয়েছে। তবে মাসান্তে পৌনে দুশ' টাকা মাইনে দিতেন। থ্যাটারের রাতে একবেলা খোরাকিও।

প্রশ্ন : তাহলে বিশুবাবুর মৃত্যুতে তোমার কোন দিক থেকেই কিছু লাভ হয়নি?

উত্তর : লাভ! কী বলছেন স্যার! আমার তো সমূহ লোকসান। চাকরিটাই থাকবে কিনা তা মা ভগবান জানেন, তার উপর নগদ পাঁচশ টাকা জলে গেল!

প্রশ্ন : পাঁচশ টাকা! সেটা কী রকম?

(সাক্ষী নীরবে তার ফতুয়ার পকেট থেকে উদ্ধার করে একটি বিয়ারার-চেক[২] দেখায়। ন্যাশনাল গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কের[৩]। তাতে পূর্বদিনের তারিখ দেওয়া, ফিগারে ও অঙ্কে পাঁচশ টাকার নির্দেশও আছে, অথচ চেকের নিচে কারও সই নেই — প্রাপক শ্রী কালীকিঙ্কর দাস।)

প্রশ্ন : এটা কি?

উত্তর : আজ্ঞে আমার দ'য়ে-মজার[৪] দলিল। বড়বাবুর ছিল দিলদরাজ মেজাজ। মাসখানেক আগে ওঁকে ধরে পড়েছিলাম শ-দুয়েক টাকা হাওলাতের জন্যে। আমার বউকে ক'লকাতায় নিয়ে আসব বলে। বস্তিতে একখান কামরাও পেয়েছিলাম মনোমত। বড়বাবুকে বলেছিলাম, মাসে মাসে মাইনে থেকে টাকাটা কেটে নিতে। তা গতকাল বড়বাবুর কী খেয়াল হল, আমাকে ডেকে বললেন, 'দাস, তোমার বিরহ য্-যন্ত্রণা আমার আর সহ্য হচ্ছে না। এই নাও পাঁচশ' টাকার চেক। হাওলাৎ[৫] নয়, দান। সোমবার দেশে চলে যাও, বউ নিয়ে বুধবারের মধ্যে ফিরে এস। বিষুৎবার 'শো' আছে, মনে থাকে যেন। আমাকে দ'য়ে মজিও না!

প্রশ্ন : তা চেকের তলায় সই নেই কেন?

উত্তর : তাই তো বল্‌ছি স্যার! আমাকে দ-য়ে মজাতে বারণ করে তিনিই আমাকে দ-য়ে মজিয়ে গেলেন। 'ঘর সব্বস্যি তোমার, চাবিকাঠিটি আমার!' বললাম হুজুরকে, 'স্যার সই ছাড়া চেক নিয়ে কি ফয়দা?' তা উনি বললেন, 'দাস, আজ শনিবার, বারোটায় ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে গেছে। সোমবার বেলা দশটার আগে টাকাটা তুমি তুলতে পারবে না। তোমার চালচুলোর নেই ঠিক, বিড়ির বান্ডিলের সঙ্গে অত টাকার বিয়ারার চেক তোমার ফতুয়ার পকেটে থাকা ঠিক নয়। তুমি সোমবার সকালে আমাকে দিয়ে সই করিয়ে ব্যাঙ্কে যেও।' আমি বললাম, 'তাহলে চেকটাও না হয় সোমবার দেবেন।' তা আমার মালিক ছিলেন, স্যার, রসিক মানুষ। বললেন, 'দাস, আমি এখন মু-মুডের মাথায় আছি; এখন আমার মনে হচ্ছে মে-মেয়েমানুষ পোষার চেয়ে বউ পোষাই ভাল। সোমবার পর্যন্ত আমার এই মুড নাও থাকতে পারে। চেকটা তোমার কাছেই থাক।

প্রশ্ন : তোমার সঙ্গে বিশুবাবুর এসব কথা কখন হয়েছিল?

উত্তর : শনিবার। মানে গতকাল ফার্স্ট শো-র আগে। ঘড়িটাতো খুইয়েছি স্যার, সময় ঠিক বলতে পারব না — এ্যাই ধরুণ বেলা দুটো নাগাদ।

প্রশ্ন : হঠাৎ বিশুবাবু অমন 'মুডি' কেমন করে হয়ে পড়েছিলেন জানো?

উত্তর : জানি স্যার। কিন্তু ছোট মুখে সেটা বড় কথা হয়ে যাবে না কি? কে যে এরপর আমার মালিক হবেন তাই তো জানি না।

ইন্সপেক্টার : তোমার ভয় নেই। এসব কথা প্রকাশ পাবে না। তুমি নিঃসঙ্কোচে বলতে পার।

উত্তর : (সসঙ্কোচে) মালিকের ইস্ত্রি ... মানে, ঠিক ইস্ত্রি নয় ... অর্থাৎ সু-সু-সু—

প্রশ্ন : বুঝেছি। ব্রজদুলালের সঙ্গে সুলোচনাকে কোন ঘনিষ্ঠ অবস্থাতে দেখেই তোমার মালিকের হঠাৎ মনে হয়েছিল — মেয়েমানুষ পোষার চেয়ে বউ পোষা ভাল।

উত্তর : সবই তো বোঝেন স্যার! শুধু-মুধু আমার মুখ দিয়ে ব্-বলিয়ে নেন কেন?

প্রশ্ন : আচ্ছা, প্রভু সিং-এর বোন সোমরিয়ার প্রতি তোমার মালিকের কোনও আসক্তি ছিল?

উত্তর : না স্যার। সোমরিয়া খুব ভাল মেয়ে। কোনদিন তার কোন বেচাল দেখিনি।

ইন্সপেক্টর : আচ্ছা তুমি এখন যেতে পার।

সাক্ষী : এবার আমি একটা প্রশ্ন শুধাব স্যার?

ইন্সপেক্টর : শুধাও।

সাক্ষী : এ চেকটা কি আর কিছুতেই ক্যা-ক্যাস করা যাবে না?

ইন্সপেক্টর : না! ওটা হচ্ছে বিশুপালের শেষ প্রহসন। তোমাকে দ-য়ে মজানোর দলিল!

২। বিয়ারার চেক : যে কোনো ব্যাঙ্কে যে চেক দেখালে বহনকারী চেকে–লিখিত অর্থ দাবি করতে পারে, তাকে বিয়ারার চেক বলে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এধরণের চেকে প্রাপকের নাম লেখা থাকে।

৩। ন্যাশনাল গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কের : National and Grindlays Bank. ১৮২৮ সালে লন্ডনের রবার্ট মেলভিন গ্রিন্ডলে, Leslie & Grindley নামের একটি ফার্ম খোলেন। ধীরে ধীরে এটি ব্যাঙ্কে পরিণত হয়। ১৮৬৫ সালে

কলকাতা ও বোম্বেতে প্রথম গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কের শাখা খোলে। স্বাধীনতার পরবর্তী কাল, ১৯৫৯ সালে ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ও গ্রিন্ডলেজ স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড একসাথে মিশে ন্যাশনাল এন্ড গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্ক-এ পরিণত হয়। বর্তমানে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাঙ্ক নামে পরিচিত (২০০০ সাল থেকে)।

৪। দ'য়ে মজা : প্রচলিত প্রবাদ। দ'-শব্দটি হ্রদ থেকে আগত। হ্রদ > হদ > দহ > দ। অর্থাৎ অথৈ জলে পড়া।

৫। হাওলাৎ : হাওলাত। মানে ঋণ কর্জ বা ধার; ন্যাস, আমানত। আরবী হাওলাৎ থেকে আগত। (উৎস—সরল বাঙ্গালা অভিধান, সুবলচন্দ্র মিত্র সংকলিত। অষ্টম সংস্করণ জুলাই, ১৯৯৩, নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাঃ লিঃ)। এখানে নারায়ণ সান্যাল বাংলা হাওলাত বানানটি ব্যবহার না করে মূল আরবীটি ব্যবহার করেছেন।

জবানবন্দীর নথি এখানেই শেষ। ব্যোমকেশ তার নিঃশেষিতপ্রায় সিগারেটটা ছাইদানে নিক্ষেপ করে তুলে নিল ময়নাতদন্তের[৬] রিপোর্টখানা। ডাক্তারি পরিভাষার কচকচি সরল করে নিলে রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য : মৃত্যুর সময় — রবিবার, ত্রিশে অগস্ট ১৯৭০, রাত্রি নয়টা থেকে সাড়ে নয়টা। মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। মৃতের দেহে কোন ক্ষতচিহ্ন ছিল না। পাকস্থলীতে অর্ধজীর্ণ স্বাভাবিক খাদ্যের অবশেষ ছিল। মৃত্যুর পূর্বে হৃদ্‌যন্ত্র স্বাভাবিক ছিল। মৃত্যুর হেতু হায়ড্রোসায়ানিক এ্যাসিডের[৭] বিষক্রিয়া। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে লোকটি জ্ঞান হারায়। সম্ভবতঃ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে সে জ্ঞান হারায় — কিন্তু শ্বাসরুদ্ধ হয়ে তার মৃত্যু হয়নি। তার কণ্ঠনালীতে দুদিকে আঙুলের দাগ আছে। মৃত ব্যক্তির মুখ-ব্যাদান অবস্থায় 'রিগর-মর্টিস্'[৮] হয়েছে। অর্থাৎ মৃত্যু সময়ে তার মুখ হাঁ-করা ছিল, সেটা আর বন্ধ হয়নি। মুখ-বিবরে যথেষ্ট পরিমাণ হায়ড্রোসায়ানিক এ্যাসিডের অবশেষ[৯], রাসায়নিক অনুষঙ্গ ও কাচের টুকরা ছিল।

রিপোর্টখানা সরিয়ে রেখে ব্যোমকেশ আর একটা সিগারেট ধরাবার উপক্রম করছে, হঠাৎ নজর হল পাশের ঘরের পরদা সরিয়ে দারোগা মাধব মিত্র এবং প্রতুলবাবু ফিরে আসছেন। দুটি সন্ধানী চোখের দৃষ্টি মেলে এবং কণ্ঠে নির্লিপ্ততার রেশ টেনে দারোগা মাধববাবু বলেন, পড়লেন? কী বুঝলেন বলুন?

ব্যোমকেশ বললে, পড়লাম। আপনি বেশ দক্ষতার সঙ্গে সকলের জবানবন্দী নিয়েছেন দেখলাম।

মাধব-দারোগা হেসে বলেন, এটাই আমার পেশা ব্যোমকেশবাবু, সখের নেশার ব্যাপার তো নয়। আপনি গুণী লোক, তাই এ্যাপ্রিশিয়েট করলেন।

ব্যোমকেশ মনে মনে হাসে। মাধববাবু মিষ্টভাষী এমন একটা কথা ইন্সপেক্টর রাখাল সরকার বলেছিল বটে। তা মিছ্‌রির ছুরির স্বাদ তো মিষ্টিই হবে। সখের গোয়েন্দা ব্যোমকেশের সঙ্গে প্রফেশনাল দারোগার পার্থক্যটা কায়দা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন — অথচ বাচনভঙ্গি অতি অমায়িক!

: তা বুঝতে পারলেন কিছু? — মাধববাবু অতঃপর প্রশ্ন করেন।

: না। বুঝিনি কিছু। কিন্তু কি জানেন — জবানবন্দীর মধ্যে কোথায় কি যেন একটা মস্ত অসঙ্গতি রয়ে গেছে। ঠিক কোথায়, কার জবানবন্দীতে, কী-জাতীয় অসঙ্গতি তা অবশ্য মনে করতে পারছি না।

প্রতুলবাবু বলেন, সে আবার কি?

ব্যোমকেশ হেসে বললে, ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা শক্ত। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে, এই আটখানা জবানবন্দীর মধ্যে কোথায় কে যেন একটা বেফাঁস কথা বলেছে।

মাধববাবু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেন, ওঃ। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়।

ব্যোমকেশ ঘুরে বসে। বেশ জোরের সঙ্গে বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ! ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়! ওটা সখের গোয়েন্দাদের[১০] থাকে!

প্রতুলবাবু বাধা দিয়ে বলেন, না না, ব্যাপারটা বুঝে নিতে হচ্ছে।

যেন কিছুই হয়নি, ব্যোমকেশ বিশেষ করে প্রতুলবাবুকেই বলতে থাকে, এমন আমার প্রায়ই হয়, প্রতুলবাবু। কিছুদিন আগে নিরুপমা হোটেলের দুই নম্বর ঘরে[১১] একটা হত্যা রহস্যের কিনারা করবার সময়ও এমনটা ঘটেছিল। সেবারও সকলের এজাহার শুনে মনে হয়েছিল — কোথায় কি-যেন একটা প্রকান্ড অসঙ্গতি রয়ে গেছে। সে সময় কিছুই মনে পড়েনি, কিন্তু ঐ অনুভূতিটা ছিল। মনে পড়েছিল অনেক পরে। এবারও, ঐ কয়জনের জবানবন্দী পড়তে পড়তে আমার মনে হয়েছে যুক্তি নির্ভর সিদ্ধান্তে যা হওয়া উচিত ছিল, তা হয়নি — কোথায় কি-যেন একটা অসঙ্গতি রয়ে গেছে। সে যাই হোক, মাধববাবু, আপনি বলেছিলেন, ঘটনাকালে মঞ্চের উপর যে কয়জন উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে ছাঁটাই করে গুটি-তিনেক লোককে দাঁড় করানো গেছে। সেই তিনটি ভাগ্যবান কে?

মাধববাবু বলেন, এক নম্বর ব্রজদুলাল ঘোষ। বিশুপালের কণ্ঠনালীতে যে দুটি আঙ্গুলের দাগ পাওয়া গেছে তা নিঃসন্দেহে ব্রজদুলালের। মল্লযুদ্ধের সময় সে হয়তো অভিনয় করেনি, সত্যই চেপে ধরেছিল বিশুপালের কণ্ঠনালী। আর দমবন্ধ হয়ে বিশুপাল যখন অজ্ঞান হয়ে যায় তখন তার হাঁ-করা মুখে হায়ড্রোসায়ানিক এ্যাম্পুলটা ফেলে অন্ধকারে সড়ে-পড়া তার পক্ষে খুবই সহজ।

প্রতুলবাবু বলেন, কিন্তু ব্রজদুলাল এ-কাজ কেন করবে?

: দুটি উদ্দেশ্য থাকতে পারে। প্রথমতঃ ব্রজদুলালই সুলোচনাকে এই থিয়েটারে আনে। সুলোচনা ভদ্রঘরের মেয়ে নয়[১২]। বিশুপাল অর্থবলে ব্রজদুলালের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিল, এটা তারই প্রতিহিংসা হতে পারে। সে-ক্ষেত্রে বলা চলে, মঞ্চে সে রাত্রে সত্যসত্যই কীচকবধ হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ বিশুপাল ব্রজদুলালকে নমিনি করে মোটা টাকার ইন্সিওর করেছিল। সে টাকার লোভেও হতে

৬। ময়নাতদন্তের : Post-mortem। অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে শব ব্যবচ্ছেদ দ্বারা মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ণয়। উর্দু শব্দ 'ময়য়ানা' (Moyaina) থেকে আগত। যার মানে অকুস্থলে গিয়ে পর্যবেক্ষণ ও তদন্ত।

৭। হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিডের : এর আরেক নাম প্রুসিক অ্যাসিড। ফর্মুলা HCN। ২৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার ওপর বাষ্পীভূত হয়। গন্ধ বাদাম তেলের মতো। তীব্র বিষ, উদ্বায়ী। প্রশ্বাসের মাধ্যমে প্রবেশ করলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু। সোডিয়াম ও পটাশিয়াম সায়নাইড তৈরির অন্যতম উপাদান। তিমি মারতে হারপুনে এই বিষ ব্যবহৃত হয়।

৮। রিগর মর্টিস : Rigor Mortis। ল্যাটিন শব্দ rigor মানে শক্ত এবং mortis মানে মৃত। মৃত্যুর পর মৃতদেহের মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তনের জন্য দেহের পেশী শক্ত হয়ে যায়। মৃত্যুর তিন থেকে চার ঘন্টার মধ্যে রিগর মর্টিস শুরু হয় যা চরমে ওঠে ১২ ঘন্টা বাদে এবং তারপর আবার শক্তভাব কমতে থাকে। মৃত্যুর ২৪ ঘন্টা বাদে দেহ আবার স্বাভাবিক হয়। মৃত্যুর ক্ষণ নির্ণয়ে রিগর মর্টিস সাহায্য করে। এক্ষেত্রে মৃত-ব্যক্তির মুখ-ব্যাদান করে 'রিগর মর্টিস' মানতে কষ্ট হয়। তিন-চার ঘন্টাতেও কেউ বিশুপালের হাঁ বন্ধ করেন নি! হয়তো পুলিসের ভয়ে।

৯। এ্যাসিডের অবশেষ : হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড অত্যন্ত উদ্বায়ী। শরদিন্দুর বিশুপাল বধ-এও দেখি ব্যোমকেশ বলছে 'মাধববাবু আমরা মৃতদেহের কাছে একটা গন্ধ পেয়েছি। এই বেলা আপনি সেটা শুঁকে নিলে ভালো হয়। গন্ধটা বোধহয় স্থায়ী গন্ধ নয়।' যেখানে তিন-চার ঘন্টা মুখ হাঁ করে থাকার পরও 'যথেষ্ট পরিমান' অ্যাসিডের অবশেষ পাওয়াটা বেশ কষ্টকল্পিত।

১০। সখের গোয়েন্দাদের : ব্যোমকেশ নিজেকে গোয়েন্দা বলছে!! আশ্চর্য। বুড়ো বয়সে কি তবে তার মত বদলালো? কারণ তার প্রথম অভিযান 'সত্যান্বেষী' (কালানুক্রমে তৃতীয়)-তে দেখি অজিত বলছে, 'সত্যান্বেষীটা কি?'

— 'ওটা আমার পরিচয়। ডিটেক্‌টিভ কথাটা শুনতে ভালো নয়, গোয়েন্দা শব্দটা আরো খারাপ। তাই নিজের খেতাব দিয়েছি — সত্যান্বেষী। ঠিক হয়নি?'

১১। দুই নম্বর ঘরে : মূল কাহিনি — রুম নম্বর দুই। ১৩ জুলাই ১৯৬৪তে রচিত। এই কাহিনি থেকেই অজিতকে সরিয়ে সর্বজ্ঞ কথকের আসন নিচ্ছেন শরদিন্দু নিজে। কারণ হিসেবে জানাচ্ছেন, 'অজিতকে দিয়ে ব্যোমকেশের গল্প

পারে। হয়তো দুটো 'মোটিভ' এক যোগে কাজ করেছিল। প্রম্টার কালীর এজাহার থেকে জানা যাচ্ছে সুলোচনা ঘটনার কিছু পূর্বে বিশুপালের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে তার পুরানো নাগরের দিকেই ঢলেছিল। এমনও হতে পারে যে, ব্রজদুলাল দীর্ঘদিন ঐ এ্যাম্পুলটা নিয়ে প্রতীক্ষা করছে, সুলোচনাকে জয় করার পরে ঐ রাত্রে সে কার্যোদ্ধার করে।

ব্যোমকেশ বলে, আর বাকি দু-জন?

: দু-নম্বর মণীশ ভদ্র। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, ভদ্র মশাই তাঁর এজাহারে একটি অভদ্রোচিত মিথ্যা কথা বলেছে। সে বলেছিল, 'বিশুবাবু আমাকে গাড়ি কিনে দিলেন। ... তখন আমি মাদ্রাজের অফারটা ছেড়ে দিলাম। দেশ ছেড়ে কে আর বিদেশে যেতে চায়?' — এ-কথাগুলো আদালতের ভাষায় 'হোল-ট্রুথ'[১৩] নয়। আমি মাদ্রাজী সিনেমা কোম্পানির সন্ধান জেনে সেখানে খোঁজ করে জেনেছি, মণীশ অফারটা ছেড়ে দেয়নি আদৌ। সে ওদের লিখেছিল — বর্তমান মালিকের সঙ্গে তার তিনমাসের চুক্তি আছে। তিনমাস অতিক্রান্ত হলে সে ঐ কাজে যোগ দিতে প্রস্তুত।

প্রতুলবাবু বলেন, অর্থাৎ মণীশ বিশ-হাজার টাকার স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড[১৪] গাড়িটা বিশুপালের কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়ে দেড় হাজার টাকার চাকরিতে যোগ দেবার তালে ছিল। বিশুপাল বেঁচে থাকতে তার পক্ষে দু-দিক বাঁচানো সম্ভবপর নয়, কেমন?

মাধব মিত্র বলেন, ঐ সঙ্গে আরও বিবেচনা করুন — বিশুপাল চিরকালই নতুন নতুন স্ত্রী-রত্নের সন্ধানে ব্যাগ্র। সুলোচনা দেবীর বয়স হয়েছে; অপরপক্ষে মণীশের স্ত্রী মালবিকার 'বয়স কম, দেখতেও সুন্দরী। কিন্তু চোখের ঋজু দৃষ্টি ও চিবুকের মজবুত গড়ন থেকে চরিত্রের দৃঢ়তা অনুমান করা যায়।' কিন্তু যদি লালসার বশে অমন একটি দৃঢ়চেতা মেয়ের প্রতি বেচাল ব্যবহার করে তবে তার পক্ষে চেঁচামেচি হৈ-চৈ না করে এমন একটি কাজে স্বামীকে সাহায্য করাই সম্ভব। সে ক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে অন্ধকারের মধ্যে প্রতুলবাবু যে চুড়ির ঝনৎকার[১৫] শুনেছিলেন সেটা মালবিকা ভদ্রের — আর তাই এতগুলি লোকের মধ্যে মালবিকাই সবচেয়ে বেশি 'শক' পায়! কি বলেন ব্যোমকেশবাবু?

ব্যোমকেশ নির্লিপ্তের মতো বলে, অসম্ভব নয়! মটোর গাড়ির লোভ অতি সাঙ্ঘাতিক লোভ! তবু দেখুন, এ দুনিয়ায় কত জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত ছাঁ-পোষা সাধারণ মানুষকে মটোর গাড়ির লোভ দেখায়!

মাধব মিত্র এই অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্যের ধরতাইটা ধরতে পারেন না; কিন্তু তাঁর পার্শ্ববর্তী জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত মানুষটির মুখে একটা বিচিত্র হাসির রেখা ফুটে ওঠে। মাধববাবু তখন নিজে থেকেই বলেন, আর তিন নম্বর সন্দেহজনক ব্যক্তি — ডাক্তার অমল পাল।

: অমল পাল! কিন্তু সে তো স্টেজের ধারে কাছে ছিল না।

: না, তা ছিল না। তাই অমল পাল যদি মলযুক্ত হয়ে থাকে তবে ধরে নিতে হবে সে ঐ আটজনের মধ্যে কোন একজনকে অর্থমূল্যে সহকারী করে নিয়েছিল।

: কাকে?

: যে কোন একজনকে। ধরুন কাঞ্চনজঙ্ঘাকে! ছেলেটা 'মারিওয়ানা'[১৬] সেবন করে। পাঁড় নেশাখোর হিপি! ক্রাইম ছবি দেখে বেড়ায় — সাজ পোষাক, আচার-ব্যবহারও ঐ রকম। টাকার লোভে সে অমল পালের সহকারী হতে রাজী হয়ে থাকতে পারে। তাই অপরাধবোধে সে নিপাট ঘুমের অভিনয়টা করেছে। এত গণ্ডগোলেও তার ঘুম ভাঙেনি!

প্রতুলবাবু বলেন, কিন্তু অমল পালের স্বার্থ?

মাধববাবু অতঃপর কিছু গূঢ় তথ্য পরিবেশন করেন। মৃত বিশু পালের সম্পত্তির পরিমান, কে তার ওয়ারিশ তা জানবার জন্য মাধব মিত্র সলিসিটার সিংহ-রায়ের অফিসে হানা দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি একটি বিচিত্র সংবাদ সংগ্রহ করেছেন। বিশ্বনাথ পালের সমস্ত সম্পত্তি স্বোপার্জিত, পৈত্রিক নয়। ফলে, তার উইলে অন্য রকম নির্দেশ থাকলে অমল পাল এক কপর্দকও দাবী করতে পারে না। বিভিন্ন ব্যাঙ্কে, কোম্পানির কাগজে ও শেয়ারে বিশু পালের লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি আছে। থিয়েটার হলের মালিকও সে একা। সলিসিটারের মতে জমি-বাড়ি-সাজসরঞ্জাম ও 'গুড-উইল'[১৭] সমেত সে সম্পত্তির বর্তমান মূল্যমান দুই লক্ষ টাকার কাছাকাছি। এছাড়াও ছিল একটি বিলাতী মডেলের সিডান বডি[১৮] পুরানো গাড়ি। সিংহ-রায় জানিয়েছেন, প্রায় বছর পাঁচেক আগে বিশু পাল একটি উইল করে তাঁর অফিসে জমা রেখেছিল। রেজিস্ট্রি করানো হয়নি সেটা। সেই উইল মোতাবেক তার শেয়ার, নগদ ও কোম্পানির কাগজ সমস্তই পাবে তার ছোটভাই ডাক্তার অমল পাল। গাড়িটা দিয়েছিল তার মঞ্চের প্রধানা অভিনেত্রী সুলোচনাকে এবং থিয়েটারের লেখানো আর চলছে না। একে তো ভাষা সেকেলে হয়ে গেছে, এখনো চলতি ভাষা আয়ত্ত করতে পারে নি, এই আধুনিক যুগেও 'করিতেছি', 'খাইতেছি' লেখে। উপরন্তু তার সময়ও নেই। পুস্তক প্রকাশকের কাজে যে লেখকরা মাথা গলিয়েছেন তারা জানেন, একবার মা-লক্ষ্মীর প্রসাদ পেলে মা-সরস্বতীর দিকে আর নজর থাকে না। তাছাড়া সম্প্রতি অজিত আর ব্যোমকেশ মিলে দক্ষিণ কলকাতায় জমি কিনেছে, নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে, শিগগিরই তারা পুরনো বাসা ছেড়ে কেয়াতলায় চলে যাবে। অজিত একদিকে বইয়ের দোকান চালাচ্ছে, অন্যদিকে বাড়ি তৈরির তদারক করছে; গল্প লেখার সময় কোথায়? দেখেশুনে অজিতকে নিষ্কৃতি দিলাম। এখন থেকে আমিই যা পারি লিখব।"

১২। ভদ্রঘরের মেয়ে নয় : এটা তো শরদিন্দু লেখেন নি! তার জবানবন্দিতে সুলোচনা জানায় সে, 'মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। কম বয়সে বিধবা হয়েছিলুম। থিয়েটারের দিকে ঝোঁক ছিল। সুযোগ পেয়ে চলে এলুম।' এ থেকে কি ভাবে বোঝা গেল যে সে ভদ্রঘরের মেয়ে নয়?

১৩। হোল-ট্রুথ : আবার শরদিন্দুর ব্যোমকেশে পি. কে. বাসু ভর করেছেন। একেবারেই আদালতের শব্দ। কাঁটা সিরিজের বহু ব্যবহৃত 'ট্রুথ, হোল-ট্রুথ এন্ড নাথিং বাট ট্রুথ'। বিদেশি (ইংল্যান্ড ও আমেরিকা) আদালতে ব্যবহৃত বহু পরিচিত শপথ বাক্যটি হল, "I promise before Almighty God that evidence which I shall give shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth."

১৪। স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড : স্ট্যান্ডার্ড মোটর প্রোডাক্ট একটি মাদ্রাজে অবস্থিত ভারতীয় মোটর কোম্পানি যা ১৯৪৯ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত নানা রকমের গাড়ি তৈরি করত Standard ব্র্যান্ড নামে। তাদের সবচেয়ে বিখ্যাত মডেলের

গাড়িটি ছিল স্টান্ডার্ড হেরাল্ড। এটি প্রথমে ব্রিটিশ যন্ত্রপাতিতে তৈরি হলেও পরবর্তীকালে (১৯৬৫ থেকে) এর ইঞ্জিন, গিয়ার, এক্সেল ভারতে তৈরি হতে থাকে। ১৯৬৬ থেকে

মালিকানা সে একটি ট্রাস্টিকে দেবার প্রস্তাব করেছিল। ঐ ট্রাস্ট-বডি থিয়েটার চালাবে, নাট্যোন্নয়নের যাবতীয় ব্যবস্থা করবে লভ্যাংশ থেকে। ঐ ট্রাস্ট-বোর্ড গঠন করবার ব্যাপারে তার প্রস্তাবটাও ছিল বিচিত্র। উইলে সে স্বহস্তে লিখেছিল — বাংলাদেশের দশজন স্বনামধন্য বিখ্যাত ব্যক্তির নাম। তার বক্তব্য — পর্যায়ক্রমে ঐ দশজনকে পর পর অনুরোধ করতে হবে। প্রথম দিক থেকে তার মধ্যে যে-কোন তিনজন, যাঁরা রাজী হবেন, তাঁরা এই কলা-মন্দিরের পরিচালনা করবেন। সেই বোর্ড-মেম্বার তিনজনকে 'অনারোরিয়াম' বা মর্যাদা হিসাবে মাসিক পাঁচশত টাকা দেওয়া হবে। কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে ঘটনার দিক সকালে বিশু পাল সলিসিটারের কাছ থেকে ঐ উইলখানা ফেরত নিয়ে যায়। বলে, সে নাকি নূতন করে উইল করবে।

প্রতুলবাবু বলেন, এ তো মারাত্মক কথা মশাই। তা সে উইলটা উদ্ধার করা যায়নি?

মাধব মিত্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে প্রতুলবাবুকে দেখছিলেন। তিনি কোন জবাব দেন না।

প্রতুলবাবু তাগাদা দেন, কি মশাই? চুপ করে আছেন কেন?

মাধব চোখ দুটি ছোট ছোট করে বলেন, সেই উইলখানা উদ্ধার করা না-গেলে মৃত বিশুপালের স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি — মায় ঐ থিয়েটারের মালিকানা বর্তাবে তার একমাত্র নিকট আত্মীয় অমল পালের উপর।

প্রতুলবাবু বলেন, কী দুঃখের কথা!

মাধব তৎক্ষণাৎ প্রতিপ্রশ্ন করেন, কেন? দুঃখের কথা কিসের? বিলাতী গাড়িখানা কুলত্যাগিনী সুলোচনার বদলে, পশারহীন গরিব ডাক্তার অমল পাল পেলেই তো ভাল।

প্রতুলবাবু মাথা নাড়েন, না, না, গাড়ির কথা আমি আদৌ ভাবছি না। আমি ভাবছি ঐ থিয়েটার পরিচালনার কথা। 'নটকেশরী' সুন্দর একটা পরিকল্পনা করেছিল। অমল পাল নাট্য-কলার কীই বা বোঝে! সে কি ঠিক মত চালাতে পারবে?

মাধব এবারও নির্লিপ্তের মত বললে, ও! আপনি বুঝি থিয়েটার পরিচালনার কথা ভাবছিলেন! তা সত্যি! বাঙলা দেশের তিনজন গণ্যমান্য পণ্ডিত ব্যক্তি মাসিক পাঁচশ টাকা উপার্জন থেকে বঞ্চিত হলেন।

প্রতুল বলেন, তা তো বটেই! তা ছাড়া—

বাধা দিয়ে ব্যোমকেশ বলে ওঠে, একটা কথা। অমল পাল কি জানত যে বিশুবাবু ঐ দিন উইলটা ফেরত নিয়ে গেছে?

দারোগা মাধব মিত্র সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে হঠাৎ প্রতুলচন্দ্রকে প্রশ্ন করে বসেন, কিছু মনে করবেন না প্রতুলবাবু, বিশু পালের সঙ্গে আপনার আলাপ কতদিনের?

প্রতুলচন্দ্র যেন আকাশ থেকে পড়েন। আমতা আমতা করে বলেন, কী বলছেন মশাই, বিশু পালের সঙ্গে আমার জীবনে কখনও বাক্যালাপই হয়নি! দূর থেকে স্টেজে দেখেছি মাত্র।

: তাই নাকি! কিন্তু শুনতে পাই বিশু পালের খেতাব 'নটকেশরী' আপনারই দেওয়া?

: আমার দেওয়া! তার মানে?

মাধব মিত্র তার ফোলিও ব্যাগ থেকে একটি জীর্ণপ্রায় পত্রিকার কাটিং বার করে প্রতুলবাবুর সামনে মেলে ধরে বলে, দেখুন তো, এ সমালোচনাটা কার লেখা?

ব্যোমকেশ কোন আগ্রহ দেখায় না। সে নীরবে একটি সিগারেট ধরায়।

প্রতুলবাবু কিন্তু হুমড়ি খেয়ে পড়েন কাগজখানার উপরে। বিশু পালের একটি নাটকের সমালোচনা যে একটি বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল — প্রতুলচন্দ্র যে স্বনামে সেই সমালোচনা লিখেছিলেন, এবং সেই প্রশংসামূলক সমালোচনাতেই যে তিনি 'নটকেশরী' বিশেষণটা প্রথম ব্যবহার করেছিলেন — যা পরবর্তীকালে থিয়েটার মহলে চালু হয়ে যায়, এসব কথা অধ্যাপক মশাই বেমালুম ভুলে গেছেন।

ব্যোমকেশ নীরবে ধূমপান করে চলেছে। প্রতুলচন্দ্র নিজের লেখা নিজে পড়ছেন, আর মাধব মিত্র তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি মেলে লক্ষ্য করছে অধ্যাপক মশায়ের মুখে প্রতিটি ব্যঞ্জনা। পুরো পাঁচ মিনিট পরে পাঠ শেষ করে প্রতুলচন্দ্র কাগজ থেকে মুখ তুলতেই মাধব দারোগা বললেন, প্রতুলবাবু, আপনি একজন স্বনামধন্য পণ্ডিত ব্যক্তি। অধ্যাপক মানুষ। বিশু পালের 'কীচক-বধ' আপনি আগেও দেখেছেন। এখন দয়া করে বলুন তো, ঘটনার রাত্রে একেবারে সামনের সীটে — মঞ্চ থেকে তিন হাত দূরত্বে আপনার উপস্থিতি কি নিতান্তই কাকতালীয় ঘটনা?

প্রতুলচন্দ্রের মনে হল এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেতে পেলে ভাল হত। তাঁর কণ্ঠনালী ভেদ করে কোন শব্দ নির্গত হল না।

স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড তাদের নতুন মডেল স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড মার্ক ২ বাজারে আনেন। খুব সম্ভব সেই গাড়িটির কথাই বলা হয়েছে এখানে।

১৫। চুড়ির ঝনৎকার : শরদিন্দু তার বিশুপাল বধ-এ জানান যে অন্ধকার স্টেজে প্রতুলবাবু একটি মিহি আওয়াজ শোনেন।

'কি রকম মিহি শব্দ?'

' ঠিক বর্ণনা করে বোঝানো শক্ত। এই ধরুন মেয়েরা হাত ঝাড়লে যেমন চুড়ির আওয়াজ হয়, সেই রকম।'

'কাচের চুড়ি, না সোনার চুড়ি?'

'তা বলতে পারি না।....'

১৬। মারিওয়ানা : Marijuana. স্প্যানিশ 'মারিজুয়ানা' থেকে উৎপত্তি শব্দটির। একে ক্যানাবিস বা গাঁজাও বলা হয়। এতে ৪৮৩ রকম যৌগ থাকে। ঔষধরূপে ব্যবহৃত। তবে নেশার উপাদানরূপে ব্যবহার করলে স্নায়ু গতি ধীর হয়, দিবাস্বপ্ন দেখা যায়, ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়। মূল যৌগ টেট্রাহাইড্রোক্যানাবিনল (THC)।

১৭। গুড-উইল : সাধারণত কোম্পানি বিক্রির ক্ষেত্রে গুড-উইল-এর প্রশ্ন আসে। কোনো কোম্পানির ব্র্যান্ড নেম বা গ্রহণযোগ্যতার ওপর এটি নির্ভর করে। কোনো কোম্পানি তার দর ঠিক করে তার সম্পত্তির মোট পরিমান ও গুড-উইলের ওপর। বসতবাড়ির ক্ষেত্রে এটি একেবারেই খাটে না।

১৮। সিডান বডি : সিডান বা সালোঁ গাড়ি হল তিনটি কক্ষবিশিষ্ট বড়ো ধরনের একটি গাড়ি। সামনে ড্রাইভার ও তার পাশের সিট ছাড়াও

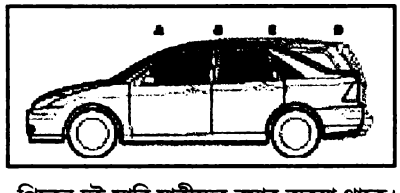

পিছনে দুই সারি যাত্রীদের বসার ব্যবস্থা থাকে। ১৮৯৯ সালের রেনোর Voiturette Type B ধরনের গাড়িকে প্রথম সিডান গাড়ির আখ্যা দেওয়া হয়। ১৯১১তে Speedwell Motor Co.-র Speedwell Sedan প্রথম সিডান শব্দটি ব্যবহার করে।

: বলুন, বলুন? এ-কথা কি সত্য যে, সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীকে এ্যালেবাই হিসাবে পাশের সীটে বসানোর উদ্দেশ্যে আপনি তাঁকে নিতান্ত পীড়াপীড়ি করে থিয়েটার হলে ধরে নিয়ে যান?

প্রতুলবাবু নিতান্ত বিহ্বলের মত বলে ওঠেন, এসব আপনি কী বলছেন মশাই?

মাধব মিত্র জবাব দেবার পূর্বেই ব্যোমকেশ বলে ওঠে, একটা কথা। মিস্টার মিত্র, বিশু পাল তার উইলে থিয়েটারের ট্রাস্টি হিসাবে যে দশজন লোকের নাম উল্লেখ করেছিল তার মধ্যে অধ্যাপক প্রতুলচন্দ্রের নামটি কি ছিল?

মাধব নাটকীয়ভাবে ব্যোমকেশের দিকে ফিরে বলে, ছিল। দশজনের তালিকায় প্রথম নামটি যাঁর, তিনিই বিশু পালের মৃত্যু সময়ে প্রেক্ষাগৃহের প্রথম সারিতে বসেছিলেন — হত্যাকাণ্ডের মাত্র তিন হাত দূরত্বে!

ব্যোমকেশ প্রতুলবাবুর দিকে ফিরে তাকায়।

প্রতুলবাবুর চোয়ালের নিম্নাংশটা ঝুলে পড়েছে। তাঁর সে-মুখের অভিব্যক্তি অবর্ণনীয়। শুধু বলতে পারি, বছর বছর যে-সব ছাত্র প্রতুলবাবুর পেপারে পাশ নম্বর পায়নি তারা সে মুখখানা দেখলে ভারী সান্ত্বনা পেত।

ত্বরিৎগতিতে এ-পাশে ফিরে মাধব দারোগা এবার প্রতুলচন্দ্রকে প্রশ্ন করে, এবার বলুন, উইলটা খোয়া গেছে শুনে আপনি অমন চমকে উঠেছিলেন কেন?

প্রবীণ অধ্যাপকের বাক্যস্ফূর্তি হলনা। সিন্ডিকেটের কোন মিটিঙে স্বয়ং ভাইস-চ্যান্সেলার পর্যন্ত কখনও তাঁর কোন কাজের কৈফিয়ৎ এমন উদ্ধত ভঙ্গিতে চান নি। তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের প্রতি সকলেই শ্রদ্ধা পোষণ করে।

ব্যোমকেশ ধীরে সুস্থে একটা হাই তুলে বলে, মিস্টার মিত্র, জবাবটা আমার কাছে শুনুন। ডাক্তাররের রিপোর্ট ইঙ্গিত করছে আপনারা ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার[১৯]-এর চার্জ আনবেন — 'কাল্‌পেব্‌ল্‌ হোমিসাইড[২০], এ্যামউন্টিং টু মার্ডার'। নিতান্ত ঘটনাচক্রে আমার শ্রদ্ধাভাজন বন্ধুটি ঘটনার সময় মাত্র ছয় ফুট দূরত্বে বসেছিলেন। তা থেকেই আপনি তাঁকে এ মামলায় জড়াতে চাইছেন। কিন্তু আপনি ভুলে গেছেন, আমার সেই বন্ধুটি একজন মানী ব্যক্তি — বাঙলাদেশের একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক! আপনি তাঁরই বাড়িতে বসে তাঁকে যে-ভাষায়, যে-ভঙ্গিতে প্রশ্ন করছেন —

বাধা দিয়ে মাধব মিত্র বলে ওঠেন, মিস্টার বক্সী, প্রশ্নটা আমি আপনাকে করিনি। কৈফিয়ৎটাও তাই আমি আপনাকে দেব না। যাঁকে প্রশ্ন করেছি, তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন —

সে-কথা সত্য। প্রতুলবাবুর মুখ একেবারে রক্তশূন্য।

ব্যোমকেশ বলে ওঠে, আমার কথাটা শেষ হয়নি মিস্টার মিত্র। এক্ষেত্রে আমার বন্ধু আপনার কোন প্রশ্নের জবাব দেবেন না; আপনি এবার আসতে পারেন।

কেউটে সাপের ল্যাজে পা পড়লে যে ভঙ্গিতে সে ছোবল তুলে ঘুরে দাঁড়ায় সেই ভঙ্গিতে রুখে ওঠেন মাধব দারোগা। বলে, মিস্টার বক্সী, আমি সখের গোয়েন্দাগিরি করতে আসিনি। আমি একটা মার্ডার কেসের তদন্তকারী পুলিশ অফিসার। আমি আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি! এভাবে আমার কর্তব্য সম্পাদনে আপনি বাধা দেবেন না।

নাটকীয়ভাবে সে আবার প্রতুলবাবুর দিকে ফিরে বসে। ব্যোমকেশকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বলে, প্রতুলবাবু যা প্রশ্ন করেছি, তার জবাব দিন। এভাবে এড়িয়ে গেলে কেসটা যে আপনার তরফে খারাপ হয়ে যাবে সে-কথা আপনার মত পণ্ডিতের বোঝা উচিত!

ব্যোমকেশও মাধব দারোগাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বলে ওঠে, প্রতুলবাবু সংবিধান আপনাকে এ অধিকার দিয়েছে। আপনি ওঁকে বলুন — আপনার উকিলের সঙ্গে পরামর্শ না করে আপনি ওঁর কোন প্রশ্নের জবাব দেবেন না।

প্রতুলচন্দ্র এতক্ষণে বাকশক্তি ফিরে পেয়েছেন। কোনক্রমে সাহস সঞ্চয় করে বলে ওঠেন, আমার উকিলের সঙ্গে কথা না বলে আমি আপনার কোন প্রশ্নের জবাব দেব না। আমি অসুস্থ বোধ করছি মিস্টার মিত্র। আমি এখন একটু একলা থাকতে চাই।

মাধব মিত্র অকারণে অট্টহাস্য করে ওঠে। কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে বলে, ঠিক আছে! চা আর প্লাস্টির জন্য ধন্যবাদ। শীঘ্রই আবার আমাদের সাক্ষাত হবে।

প্রস্থানের সময় ব্যোমকেশের দিকে একটি ছদ্ম অভিবাদন করে বললে, আপনার সঙ্গেও!

ব্যোমকেশ তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে, আলবৎ! আপনার পেশা এবং আমার নেশা যখন অভিন্ন!

মাধব দারোগার প্রস্থানের পর প্রতুলবাবু ক্রমশঃ স্বাভাবিক হয়ে ওঠেন। বলেন, এ কী ফ্যাসাদ হল বলুন দেখি!

১৯। ফার্স্ট ডিগ্রী মার্ডার : পূর্বপরিকল্পিত ও ইচ্ছাকৃত খুন।

২০। কল্‌পেব্‌ল হোমিসাইড : স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় খুন। ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ২৯৯ ধারায় এটি সম্পর্কে লেখা আছে, 'Whoever causes death by doing act with the intention of causing death, or with the intention of causing such bodily injury as a likely to cause death or with the knowledge that he is likely by such act to cause death, comunits the offence of culpable Homicide.'

ব্যোমকেশ নির্লিপ্তের মত বললে, ফ্যাসাদ কিছুই নয়। ভেবেছিলাম সেই সইহীন বিয়ারার চেকখানাই[২১] বিশু পালের শেষ প্রহসন। এখন দেখছি, তা নয় — উইল করে সে আপনাকেও ন-য়ে মজিয়ে গেছে।

ঢোক গিলে প্রতুলচন্দ্র বলেন, এই কি আপনার রসিকতা করার সময়?

: কী আশ্চর্য! আপনি এত বিচলিত হচ্ছেন কেন? আপনার কোষ্ঠীর ফলাফলে হয়তো ছিল এ-যাত্রায় পুলিশের জেরায় কিছুটা নাজেহাল হতে হবে। কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। আমি ব্যবস্থা করছি। ভাল কথা, আপনি কি শালীচরণের বৈষ্ণবীয় হনিমুনের কাহিনীটা মাধব মিত্রকে বলেছেন।

: হ্যাঁ বলেছি। আপনি যখন এজাহারের নথী পড়ছিলেন তখন। চুড়ির ঝণৎকারের কথাও বলেছি।

: হ্যাঁ, সেটা জানি। তাতেই মাধব দারোগা মালবিকা ভদ্রের চুড়ির ঝনৎকারের কথা বলল।

: সব কথা খুলে বলে কি ভাল করিনি?

: নিশ্চয় করেছেন। মার্ডার কেস! পুলিসকে সব কথা খোলাখুলি জানিয়ে রাখা ভাল।

: তাহলে তখন যে বললেন, উকিলের উপস্থিতি ছাড়া—

: সেট অন্য ব্যাপার। লোকটা পুলিসে চাকরি করতে গিয়ে আর কিছু না শিখুক ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শিখেছে। কার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় তাও জানে না। ভাল কথা, ডি.আই.জি. মজুমদার[২২] সাহেবের বাড়ি তো এ পাড়াতেই। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ আছে। চলুন, তাঁকে ব্যাপারটা জানিয়ে রাখি।

প্রতুলবাবু তৎক্ষণাৎ উঠে পড়েন : চলুন, ওঁর বাড়ি আমি চিনি। কাছেই। হেঁটে যেতে দশ মিনিটের রাস্তা।

ব্যোমকেশ বললে, তার কি দরকার? গাড়ি থাকলে দশ মিনিটের রাস্তা দু'মিনিটে পাড়ি দেওয়া যায়!

ব্যোমকেশের বক্রোক্তিটা মাঠে মারা গেল। প্রতুলবাবুর মানসিক অবস্থা তখন এমন নয় যে, বুঝে নেবেন ব্যোমকেশ সুযোগ বুঝে তাঁর কথাই তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছে। প্রতুলচন্দ্র বলেন, সেই ভাল। চলুন, গাড়ি করেই যাই।

: তবে একটু অপেক্ষা করুন। একটা টেলিফোন করে জেনে নিই তিনি বাড়িতে আছেন কিনা।

৪.

পুলিস-বিভাগের উপরমহলে সত্যান্বেষীর[২৩] এতদিনে যথেষ্ট খাতির হয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় স্বয়ং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল[২৪] পর্যন্ত তার খোঁজ করেছিলেন। ব্যোমকেশ ও প্রতুলবাবুকে ডি.আই.জি. মজুমদার সমাদর করে বসালেন। চা-সিগ্রেটে আপ্যায়নও করলেন। ব্যাপারটা ধৈর্য ধরে শুনে বললেন, আপনি একটুও চিন্তা করবেন না প্রফেসর-সাহেব। বিশু পাল তার ট্রাস্টির তালিকায় আপনার নাম যে সর্বপ্রথমে লিখেছিল এটা আপনার কোন অপরাধ নয়, বরং বিশু পাল লোকটির উপর সে-জন্য শ্রদ্ধা হচ্ছে। মাধব মিত্তির যাতে এ ব্যাপার নিয়ে আপনাকে আর বিরক্ত না করে সেটা আমি দেখব। আজকালকার ছোকরা পুলিস-অফিসারগুলোও হয়েছে এক-একটি অবধূত[২৫]! মোটকথা এই দুশ্চিন্তায় যদি আপনার অধ্যয়ন-অধ্যাপন এবং গবেষণা ব্যাহত হয়ে পড়ে তবে সেটাই আমাদের জাতীয় ক্ষতি। আপনি শান্ত মনে বাড়ি যান। কী দেখছেন ওদিকে?

অন্যমনস্ক অধ্যাপক মশায়ের দৃষ্টি সরে আসে দেওয়াল থেকে। বলেন, আপনার আয়নাটা।

: আয়নাটা! আয়নার মধ্যে দেখার কি আছে?

প্রতুলবাবু ম্লান হেসে বলেন, ইয়ে হয়েছে — কদিন আগে ব্যোমকেশবাবু বললেন, 'শালীচরণ নামে এক খুনী আসামীর তত্ত্বতাল্লাসে যাচ্ছি, যাবেন নাকি?' — তা আমি — তখন বলেছিলাম, 'বেশ তো চলুন না, আমি কখনও খুনী আসামী দেখিনি, একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে।'

এ-কথা বলে অধ্যাপক থামলেন। মজুমদার সাহেব এই ব্যাখ্যার কোনও তাৎপর্য খুঁজে পেলেন না। বললেনও সে-কথা, আমি ঠিক বুঝলাম না।

প্রতুলচন্দ্র একটিমাত্র পংক্তিতে তাঁর 'এক্সপ্লেন উইথ রেফারেন্স টু দ্য কনটেক্স'[২৬] সমাপ্ত করলেন : তাই আজ আপনার আয়নাটার ভিতর খুঁজে দেখছিলাম — খুনী আসামী কি দেখতে ঐ রকম?

মজুমদার হো-হো করে ঘর-ফাটানো অট্টহাস্য করে ওঠেন। ব্যোমকেশকে বলেন, হ্যাঁ মশাই, আপনারও যেমন কাণ্ড! এমন দার্শনিক পণ্ডিতমানুষকে এনে পেড়ে ফেলেছেন, খুন-জখমের মাঝখানে?

২১। বিয়ারার চেকখানাই : বিয়ারার চেক সইবিহীন হলে তা একেবারেই মূল্যহীন।

২২। ডি.আই.জি. মজুমদার : নারায়ণ সান্যালের সৃষ্ট চরিত্র। কেয়াতলার কাছেই থাকেন। অর্থাৎ দক্ষিণ কলকাতাতেই বাস।

২৩। সত্যান্বেষী : 'সত্যান্বেষী গল্পে (২৪ মাঘ ১৩৩৯) ব্যোমকেশ চরিত্রটিকে এসট্যাব্লিস করি।' ব্যোমকেশ নিজেকে এই নামেই পরিচয় দিত। 'অর্থমনর্থম' গল্পে অবশ্য সত্যবতীকে নিয়ে pun হিসেবে একে ব্যবহার করা হয়েছে।

২৪। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল : লৌহমানব নামে খ্যাত। 'আদিম রিপু' গল্পে প্রথম বল্লভভাই প্যাটেলের সাথে ব্যোমকেশের যোগাযোগের খবর পাই। এই কেস ঠিক কবে এসেছিল তার উল্লেখ নেই। তবে ঘটনাকালের মোটামুটি আন্দাজ পাওয়া যায়। ব্যোমকেশ এই কেস সেরে ফেরে ১৯৪৭ সালের ১০ আগস্ট। ১৪ আগস্ট অজিত লেখে 'এই যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইল ইহাতে আমার কৃতিত্ব কতটুকু? একটা পতাকা নাড়িয়াও তো সাহায্য করি নাই। (ব্যোমকেশ দিল্লিতে গিয়া সাত মাস ধরিয়া কিছু কাজ করিয়াছে।) ফলে ১০ জানুয়ারি থেকে ১০ আগস্ট, ১৯৪৭ ব্যোমকেশ বল্লভভাই প্যাটেলের কেস নিয়ে ব্যস্ত ছিল।

২৫। অবধূত : সংসার মায়ামুক্ত, সদাশিব। তন্ত্রমতে অবধূত সন্ন্যাসী চারপ্রকার — ব্রহ্মাবধূত, শৈবাবধূত, বীরাবধূত ও কূলাবধূত। এক্ষেত্রে অবশ্য অকর্মণ্য অর্থে ব্যবহৃত।

২৬। এক্সপ্লেন উইথ রেফারেন্স টু দ্য কনটেক্স : আগেকার দিনে ইংরেজি পরীক্ষামালার একটি 'কমন' প্রশ্ন। উদ্ধৃতি দিয়ে সেটিকে উৎস সমেত ব্যাখ্যা করতে বলা হত।

এ কী ব্যাপার! হল কী বলুন দেখি!

তোষামোদ চিকিৎসকের মত বললে, ব্যাপার কিছুই নয়। উত্তেজনায় ওঁর মস্তিষ্কে রক্তচাপ বেড়ে গিয়েছিল। চিন্তার কোনো কারণ নেই। এখন দেখছি, তা নয় — উনি যেন আপনাদের দু-দুটো সাবধান করে দিচ্ছেন।

তবে কি ইনি প্রদ্যুম্ন বললেন, এই কি আমাদের ভবিষ্যতের সংকেত নয়?

: কী আশ্চর্য! আপনি এত বিচলিত হচ্ছেন কেন? আমাদের দেশটার অনেকের হৃৎপিণ্ড এ-রকম দুর্বলতার জন্য বিগড়ে যায়, হয়। কিন্তু তার জন্য কিছু নয়। আমি শুধু বলছি। তবে কথা, আপনি কি আমাদের চৌকাঠ পেরিয়ে আসতে পারবেন? বাইরে অনেক লোক জমেছে।

: হ্যাঁ আসছি। আপনি বলুন এখানকার নতুন অতিথিদের কথা। দুটির অবস্থাটাই এমন।

~~তাহলে তারা প্রস্তুত~~

: হ্যাঁ, সেই কথাই। তাহলে আটটা-নাগাদ সাবধানে ওদের দুটির অবস্থাটাই দেখে আসা।

: সব কথা খুলে বলে কি ভাল হবে?

: নিশ্চয় বলবেন। সত্যি কথা! খুলিয়ে সব কথা বোঝাবুঝি করাই ভাল ভাবে।

: তাহলে তাই যে বললেন, উনিদের বোঝাবুঝি হবে —

: সেটা বড় ব্যাপার। সেটাই খুলিয়ে বলাই হবে কিন্তু তার কিছু না কিছুর দিকে তো বলতে হয়। তারা যদি না। তারপর, ইচ্ছে সকলের হাত মিলাবে। আর সাথে ডি. আই. জি. সদ্য এসেছেন এ কাজটায়। ওঁর সাথে আমার আলাপ আছে। চলুন, তাঁকে ব্যাপারটা জানিয়ে আসি।

প্রদ্যুম্নবাবু উত্তর দেবার আগেই: চলুন, ওঁর সাথে আমি নিজে। আসছি। যেতে যেতে বলব। ডিরেক্টর এসে।

তোষামোদ বললে, ওর কি দরকার? সাড়ে আটটা নাগাদ ডিরেক্টরের দু'বিভাগের লোক।

সেও যাক!

তোষামোদের ব্যাপারটা সাথে থাকা ভাল। প্রদ্যুম্নবাবু সাবধানে এগিয়ে এসে বললে, সেই বুঝে নেবেন তোষামোদ সুযোগ বুঝে ওঁর কথাই তাঁকে বলিয়ে দিয়েছে। প্রদ্যুম্ন বললে, সেই ভাল। চলুন, সাড়ে দশটা নাগাদ।

: তবে একটু অপেক্ষা করুন। একটা টেলিফোন করে নেবার দরকার আছে।

॥ ৪ ॥

সেন্ট্রাল হলের সামনে সবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ওরা দুজন আলোচনা করছিলেন।

পুলিস-বিভাগের উচ্চমহলে সভাপতির একদিনের মধ্যে আসার কথা হয়েছে। তোষামোদ ও প্রদ্যুম্নবাবুকে ডি. আই. জি. সদ্য আসার সময়ের মধ্যে এসেছেন। ডা. মিত্রও আলোচনায় ছিলেন। প্রথমেই সেই কথা ওঠে, আপনি এখনও কিছু ঠিক না করে দেখবেন সবাই। কিন্তু আমার ভাবনার ওপর ভিত্তি করে অফিসের আমাদের নাম যে সর্বপ্রথম দিয়েছিলেন এটা আমাদের দেশে প্রথম নয়, বরং চিন্তার বিষয় ওদের সে-রকম প্রমাণ হয়। আইন বিভাগের কাছে এ ব্যাপার নিয়ে আমাদের আর কিছু না বলে সেই আমি দেখব। আইনজ্ঞদের মতে পুলিস-বাহিনীর পক্ষে হয়েছে এক-একটা প্রস্তুতি। সেইজন্য এই মুহূর্তে যদি আমাদের প্রতিনিধি-প্রতিনিধিরা এবং সাক্ষী কেউ হয়ে যায় তবে সেটা আমাদের প্রতিকূল হবে। আপনি আর যত তাড়াতাড়ি হয়। কী দেখছেন ওদিকে?

প্রদ্যুম্ন প্রতিনিধি সামনে ছুটে যাচ্ছে থামো দেওয়ালের কোণে। বললেন, আশ্চর্য!

: আশ্চর্য! আমরা সাক্ষী দেবার কি আছে?

প্রদ্যুম্নবাবু মুখ তুলে বললেন, হয়ে হয়েছে ... সেদিন যখন তোষামোদবাবু বললেন, 'সাক্ষীদের নামে যদি সুবীর আমাদের উত্তরাধিকারে থাকে, থাকবে আমি?' — তা আমি কোনো উত্তর দিইনি তাঁকে, 'সে তো আমি বলব না, আমি সবচেয়ে সুবীর আমাদের দেখেছি। একটা মস্ত অভিযোগ হবে।'

এ কথা শুনে প্রতিনিধি বললেন, মহারাজ-সাহেব এই ব্যাপারে সোজা ভাবেই খুঁজে দেখবেন

ব্যোমকেশ ছদ্ম-বিনয়ে হাত দুটি জোড় করে বলে, হুজুর, অধম নিরপরাধ! ওঁকেই জিজ্ঞাসা করে দেখুন, সে-রাত্রে, নটকেশরীর থিয়েটার দেখার প্রস্তাবটা কে প্রথম করেছিল!

প্রতুল তৎক্ষণে বলে ওঠেন, না না আমিই অপরাধী! কবুল করছি!

: অপরাধী! কবুল করছেন!

দ্বিগুণ জোরের সঙ্গে প্রতুলচন্দ্র বলেন, না না, তা নয়। মানে ... ইয়ে ... থিয়েটার দেখতে যাবার প্রস্তাবটা আমিই করেছিলাম বটে।

আবার উচ্চৈস্বরে হেসে ওঠেন ডি.আই.জি.।

মোটকথা, অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে প্রতুলবাবুরা বিদায় নিলেন। গাড়িতে উঠে প্রতুলচন্দ্র বলেন, আপনি কি বাড়ি যাবেন ব্যোমকেশবাবু? তাহলে আপনাকে একেবারে নামিয়ে দিয়ে যাই।

ব্যোমকেশ বলে, না, আমি এখন বাড়ি যাব না। একবার সিংহ-রায় সলিসিটার্স ফার্মে যাব। আপনার বাড়িতেই চলুন। টেলিফোন গাইড দেখে ঠিকানা বার করতে হবে।

প্রতুলবাবু কিন্তু ব্যোমকেশকে একা ছেড়ে দিতে রাজী হলেন না। অগত্যা দুজনেই এসে উপস্থিত হলেন সিংহ-রায় সলিসিটার্স ফার্মের অফিসে। মিশন রো-র[২৭] মোড়ে দ্বিতলে অফিস। খোঁজ নিয়ে জানা গেল সিংহ-রায় একজন ব্যক্তি নন। শ্রীযুক্ত সিংহ এবং শ্রীযুক্ত রায় যৌথ কারবার খুলেছেন। সিনিয়ার পার্টনার নিরঞ্জন সিংহ, সি.এ. অফিসে উপস্থিত ছিলেন। ব্যোমকেশের কার্ড পেয়ে তৎক্ষণাৎ ওঁদের ডেকে পাঠালেন। নিরঞ্জনবাবু মধ্যবয়সী। খর্বাকৃতি। মাথায় ব্যাকব্রাশ করা চুলে ইন্দ্রলুপ্ত অবলুপ্ত করার একটা ব্যর্থ প্রয়াস। পরিধানে বিলাতী পোষাক, চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমায় ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা। ব্যোমকেশের দিকে তিন-দুর্গ চিহ্নিত সবুজ সিগারেটের টিনটি[২৮] বাড়িয়ে ধরে বলেন, অজিতবাবুর কল্যানে আপনার সব কয়টি কীর্তি কাহিনীর সঙ্গেই আমার পরিচয় আছে। আমার ওয়াইফ্ আপনার প্রচন্ড ফ্যান। তিনি উপস্থিত থাকলে নিশ্চয় 'হেঁয়ালির ছন্দে'[২৯] বলতেন, সত্যান্বেষীকে 'খুঁজি খুঁজি নারি'[৩০], কিন্তু সেই 'অদ্বিতীয়'[৩১] 'অচিন-পাখী'[৩২] সম্পূর্ণ 'মগ্নমৈনাক'[৩৩]!

ব্যোমকেশ বুঝতে পারে, এ ভদ্রলোক অজিতের সবগুলি কাহিনীই পড়েছেন বটে।

: বলুন স্যার! আপনার কী উপকারে আসতে পারি?

ব্যোমকেশ বলে, আমি এসেছিলাম—

: সত্যান্বেষণে! সে-কথা বলাই বাহুল্য! — মুখের কথা কেড়ে নিয়ে পাদপূরণ করেন নিরঞ্জন সিংহ। ততক্ষণে তিনি তিন-দুর্গ-আঁকা টিনটি প্রতুলবাবুর দিকে বাড়িয়ে ধরেছেন। প্রতুলচন্দ্র যুক্ত করে প্রত্যাখ্যান করলেন। ব্যোমকেশ বলে, উনি অধ্যাপক মানুষ। ধূমপান করেন না। ওঁর পরিচয়টা দেওয়া হয়নি, উনি হচ্ছেন অধ্যাপক প্রতুলচন্দ্র —

: বিলক্ষণ! কী আশ্চর্য! আমার আগেই চেনা উচিত ছিল। আপনাকে ইতিপূর্বে কয়েকটি সাহিত্যসভায় দেখেছি। না, না মশাই, সাহিত্যের বাতিক আমার নেই — আমি শুধু ক্যাপের হিসাবে যাই : আমার ওয়াইফ-এর আবার ঐ বাতিক! সে যখন জানবে, আপনারা দুই দিক পাল আজ আমার অফিসে —

এবার ব্যোমকেশই ওঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলে, আপনি ব্যস্ত মানুষ। বেশী সময় আপনার নেব না। আমরা এসেছিলাম একটা খবর সংগ্রহ করতে। নটকেশরী বিশু পাল কি আপনার ক্লায়েন্ট —

: ছিলেন। তাঁর যাবতীয় কাজকর্ম আমরাই করেছি। আহা, ভদ্রলোক বেঘোরে মারা গেলেন। ও-আচ্ছা! তাহলে আপনিই এ-কেসে সত্যান্বেষণ করছেন। খবরের কাগজে যেই দেখলাম, আপনিও সেদিন থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলেন, তখনই রত্না বলল — উনি ঐ জন্যেই থিয়েটার হলে ছিলেন।

: রত্না —?

: আমার ওয়াইফ্!

: ও! তা — আপনার ওয়াইফের মতে হত্যার পূর্বেই আমি জানতাম যে, ঐ সময় খুনটা হবে?

: আপনারা তো অন্তর্যামী, স্যার।

: বুঝলাম। তা বিশুবাবুর বিষয় সম্পত্তি নিয়ে যদি প্রশ্ন করি, তাহলে কি আপনি —

অপরের কথা শেষ পর্যন্ত শোনার ধৈর্য বোধকরি সিংহ মশায়ের নেই। মাঝপথেই তিনি বলে ওঠেন, বিলক্ষণ। আপনাকে সাহায্য করব না! বলেন কি! কিন্তু দাঁড়ান, তার আগে কিছু জলযোগের ব্যবস্থা করি।

২৭। মিশন রো : কলিকাতার প্রাচীনতম রাস্তা নামে পরিচিত। ১৭৭০ সালে সুইডিশ মিশনারী যোহান কিরনানডার মিশন চার্চের প্রতিষ্ঠা করেন। আর্মেনিয়ান চার্চের পরে এটিই কলকাতার প্রাচীনতম গীর্জা। লাল গীর্জা নামে পরিচিত এই গীর্জাটি লালবাজার ও লালদিঘির

নিকটে অবস্থিত। এই রাস্তার বর্তমান নাম আর. এন. মুখার্জি রোড। ১৮২৬ সালে জন বেইলি ফ্রেজার এই গীর্জাটির একটি অপরূপ ছবি আঁকেন।

২৮। তিন-দুর্গ চিহ্নিত সবুজ সিগারেটের টিনটি : ১৭৮৬ সালে হেনরি ওভারটন উইলস্ ও তার পার্টনার ওয়াটকিংস ব্রিস্টল-এর ক্যাসল স্ট্রিটে তামাকের একটি দোকান খোলেন Wills, Watkins & Co. নামে। পরবর্তীতে তার নাম হয় 'Wills & Co.'। ১৮৭১ সালে

তাদের প্রথম সিগারেটের ব্র্যান্ড আসে 'ব্রিস্টল' নামে, ১৮৭৮ সালে আসে তাদের জনপ্রিয়তম ব্র্যান্ড 'Three Castles' এবং 'Gold Flake'. Three Castles বিক্রি হত সবুজ রঙের টিনে।

২৯। হেঁয়ালির ছন্দে : প্রকাশকাল ২৩ জানুয়ারি, ১৯৬৪।

৩০। খুঁজি খুঁজি নারি : প্রকাশকাল ২১ ভাদ্র, ১৩৬৮।

৩১। অদ্বিতীয় : প্রকাশকাল ২ ফাল্গুন, ১৩৬৮।

৩২। অচিন পাখি : প্রকাশকাল ১৩ বৈশাখ, ১৩৬৭।

৩৩। মগ্নমৈনাক : প্রকাশকাল ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩।

প্রতুলবাবু আপত্তি করেন, সেজন্য ব্যস্ত হবেন না। আমরা জলখাবার খেয়েই বেরিয়েছি!

: বিলক্ষণ! আপনারা আমার অফিসে এসে শুধু মুখে ফিরে গেছেন শুনলে — এবার ব্যোমকেশই পাদপূরণ করে : আপনার ওয়াইফ্ আপনার মুখদর্শন করবেন না?

: এক্জ্যাক্টলি! আপনি সত্যান্বেষী! আমার আঁতের কথা টেনে বার করেছেন।

সুতরাং কফি ও কেক্‌কে আসতে দিতে হল। জলযোগের সঙ্গে সঙ্গে ব্যোমকেশের সত্যান্বেষণ শুরু হল। একের পর এক প্রশ্ন করে মৃত বিশু পালের সম্পত্তির সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সে সংগ্রহ করতে থাকে। মাধববাবু যা বলেছিলেন সে-কথাই পুনরায় শুনতে হল। উপসংহারে নিরঞ্জন সিংহ বললেন, বিশুবাবুর সেই উইলখানি যদি খুঁজে না পাওয়া যায়, তাহলে তাঁর সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হবেন তাঁর ছোটোভাই ডাক্তার অমল পাল।

ব্যোমকেশ বলে, একটা কথা। বিশু পাল মারা যান অগস্টের ত্রিশ তারিখে। আপনি বলছেন, সেদিন সকালেই বিশুবাবু এসে আপনার অফিস থেকে উইলটা ফেরত নিয়ে যান, কিন্তু হিসাবে দেখছি, সেদিন ছিল রবিবার। আপনার অফিস কি সেদিন —

: ছিল। বন্ধই ছিল। বিশুবাবু আর তাঁর ছোটভাই রবিবার সকালের দিকে আমার বাড়িতে এসেছিলেন। বিশুবাবু নিতান্ত পীড়াপীড়ি করায় আমি ওঁর গাড়িতে অফিসে আসি। দরোয়ানকে দিয়ে ঘর খোলাই। নিজে সিন্দুক খুলে উইলখানি ওঁকে ফেরত দিয়েছিলাম।

: হুম্! তাহলে অমল পালও জানত যে, উইলটা ফেরত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিশুবাবু এমন তাড়াহুড়া করার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিয়েছিলেন কি?

: হ্যাঁ। উনি বলেছিলেন, উইলটা বিশেষ প্রয়োজনে পালটাতে চান। এসব কাজ ফেলে রাখার নয়। শুভস্য শীঘ্রম[৩৪]!

: কিন্তু কেন উইলটা পালটাতে চান, তা বলেন নি?

: বলেছিলেন। আমি প্রশ্ন করায় বলেছিলেন, গাড়িটা সুলোচনাকে দেব না। ওটা 'অমুক'কে দেব।

: 'অমুক'কে মানে?

: নামটা ভুলে গেছি — মেয়েছেলের নাম। হিন্দুস্থানী নাম। মেয়েটি কে প্রশ্ন করায় বলেছিলেন ওঁর দারোয়ানের চিড়িয়া[৩৫]! তার অর্থ কি আমি জানি না।

: দারোয়ানের চিড়িয়া! নামটা কি 'সোমরিয়া'?

: এক্জ্যাক্টলি! এতক্ষণে মনে পড়েছে। সোমরিয়াই বটে!

প্রতুলচন্দ্র মাথার উপর ঘূর্ণ্যমান সিলিং ফ্যানের দিকে তাকিয়ে কী যেন একটা সংস্কৃত শ্লোক আওড়ালেন আপন মনে। দার্শনিক উক্তি!

ব্যোমকেশ সে কথায় কান না দিয়ে প্রশ্ন করে, কিন্তু কেন তিনি তাঁর গাড়িটা সুলোচনাকে না দিয়ে সোমরিয়াকে দিতে চাইছেন তা আপনি জানতে —

: চেয়েছিলাম। উনি তার জবাবে একটি রহস্যজনক জবাব দেন। বিশুবাবু মাঝে মাঝে বড় রহস্যজনক কথা বলতেন। উনি বললেন, 'সিংহ মশাই সিংহ মশাই, মাংস যদি চাও/রাজহংস খেতে দেব, হিংসা ভুলে যাও[৩৬]।' তাতে আমি বললাম, বিশুবাবু আমি আপনাকে আদৌ ঈর্ষা করছি না। সুলোচনা অথবা সোমরিয়া আপনারই থাকুক, কিন্তু এভাবে হঠাৎ কেন —; এবারও উনি আমাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, তিনটি জিনিসের কাছ থেকে সদা সর্বদা দূরে থাকবেন। এক — ভাঙা দেয়াল, দুই — ক্ষ্যাপা শেয়াল, তিন — বড়লোকের খেয়াল! এই সিদ্ধান্তটা ঐ তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত!

ব্যোমকেশ বললে, উপদেশটা মনে থাকবে। আচ্ছা আর একটা কথা — আপনার সঙ্গে যখন বিশুবাবুর এসব কথা হয়, তখন অমল পালও সেখানে ছিলেন?

: না। অমলবাবু পাশের ঘরে ছিলেন।

: অমলবাবু কি উইলের সব কথা জানেন?

: জানেন।

: বিশুবাবু কি নূতন উইলে থিয়েটারের মালিকানা ঐ ট্রাস্টির হাতেই রাখতে চেয়েছিলেন?

: হ্যাঁ। বলেছিলেন, ঐ অংশটার কোন পরিবর্তন হবে না। ট্রাস্টির জন্য যে দশজন গণ্যমান্য লোকের নাম লেখা ছিল তার মধ্যে একজন ইতিমধ্যে মারা গেছেন। সেখানে শুধু একটি নতুন নাম বসত। এছাড়া তার কোন পরিবর্তন হত না ও-ব্যাপারে। ট্রাস্টির নামের তালিকায় প্রথম নামটা ছিল প্রতুলবাবুর।

৩৪। শুভস্য শীঘ্রম : রামায়ণে উদ্ধৃত শ্লোকটি হল 'শুভস্য শীঘ্রম/অশুভস্য কালহরণম্' অর্থাৎ শুভকার্য শীঘ্র ও অশুভকার্য বিলম্বে করা উচিত।

রাবণ বধের অব্যবহিত পূর্বে মৃত্যুশয্যায় রাবণ লক্ষ্মণকে এই উপদেশ দিয়ে যান।

৩৫। চিড়িয়া : পাখি। অশ্লীল অর্থে মেয়েরূপে ব্যবহৃত।

৩৬। 'সিংহমশাই, সিংহমশাই' : উৎস 'হাসিখুসি' যোগীন্দ্রনাথ সরকার। ১ম ভাগ। অনুস্বার যোগ – [ং]

প্রতুলচন্দ্রের মুখখানা দেখে মনে হল এইমাত্র বুঝি তিনি একগ্লাস চিরতার জল খেয়েছেন। ব্যোমকেশ জানতে চায়, উইলের কি দ্বিতীয় কোন কপি নেই?

: আছে। আমার কাছেই আছে। ড্রাফ্‌ট্ কপি। তাতে বিশুবাবুর সই নেই কিন্তু। দেখবেন?

ব্যোমকেশের আগ্রহে নিরঞ্জনবাবু তাঁর ফাইল থেকে ড্রাফ্‌ট-কপিটা উদ্ধার করলেন। তাতে কারও সই নেই। সেটা আইনত সিদ্ধ নয়। ব্যোমকেশ আবার একটি সিগারেট ধরিয়ে নথীর ভিতর ডুবে গেল। ইতিমধ্যে সিংহ-রায় সলিসিটার্স ফার্মের কর্মচারীরা মাঝে মাঝে কাগজপত্র নিয়ে আসছে। সিনিয়ার পার্টনারের সই নিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে টেলিফোনও আসছে। প্রতুলবাবু উশ্‌খুশ করছেন। আর ব্যোমকেশ নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে আছে। হঠাৎ তার ধ্যানভঙ্গ হল নিম্নলিখিত কথোপকথন কর্ণগোচর হওয়ায় —

একজন কর্মচারী এসে সিংহমশাইকে জিজ্ঞাসা করল, কালীচরণবাবুর কেসটার কি করা হবে স্যার? আমরা কি ঐ একই শর্তে ওঁর বাড়ি ভাড়া আদায়ের দায়িত্ব নেব? নিরঞ্জনবাবু জবাবে বলছেন, হ্যাঁ, টাকার এ্যামাউন্টটাই বড় কথা নয়, নরেশ, ভদ্রলোক অনেক দিনের পুরানো মক্কেল — সেই আমাদের প্রথম যুগের। উনি সেবার জেলে যাওয়ার সময় যে ব্যবস্থা হয়েছিল, এবারও তাই হবে।

প্রতুলচন্দ্র খেয়াল করেননি, ব্যোমকেশ কিন্তু খাড়া হয়ে উঠে বসে। উইলের ড্রাফ্‌টখানা সরিয়ে রাখে। কর্মচারী ভদ্রলোক নির্দেশ নিয়ে চলে যেতেই বলে ওঠে, মাপ করবেন, মিস্টার সিন্‌হা, এইমাত্র যে ক্লায়েন্টের কেসটা ডিস্‌পোস করলেন সেই মক্কেলের নাম কি কালীচরণ দাস? ওরফে শালীচরণ?

নিরঞ্জন সিংহ স্তম্ভিত। চম্‌কে উঠে বলেন, বাই জোভ[৩৭]! আপনি কি ম্যাজিক জানেন?

ব্যোমকেশ সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, তাহলে শালীচরণও আপনার ক্লায়েন্ট! বছর দশেক আগে সে যখন শালীকে খুন করে জেলে যায় তখন আপনারাই তার তরফে ভাড়া আদায় করতেন?

নিরঞ্জন ভাবাবেগে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন : ইট্‌স সিম্‌প্লি মির‍্যাকুলাস্! ঈস্! রত্না যদি এখানে উপস্থিত থাকত! শী উড্ হ্যাভ...

: শালীচরণ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করলে কি আপনি জবাব দেবেন? নিরঞ্জন পুনরায় আসন গ্রহণ করেন। গলার টাইটা ধরে খামকা একটু টানাটানি করে আত্মস্থ হন। সামলে নিয়ে বলেন, দেখুন মিস্টার বক্সী, কিছু মনে করবেন না। বিশু পাল মশাই মারা গেছেন, তাই তাঁর সব কথা আপনাকে খোলাখুলি জানাতে পারছি। তাছাড়া, সেটা হল একটা মার্ডার কেস! কিন্তু কালীচরণ দাস আমার জীবিত ক্লায়েন্ট। তাঁর কোন গোপন কথা—

বাক্য অসমাপ্ত রেখে সিংহমশাই শ্রাগ[৩৮] করলেন।

ব্যোমকেশ হাস্য গোপন করে বললে, তা ঠিক! তবে এখন আমারও মনে হচ্ছে মিসেস্ সিন্‌হা যদি এখানে উপস্থিত থাকতেন, শী উড্ হ্যাভ—

: কারেক্ট! আপনার সত্যান্বেষণের পথে বাধা সৃষ্টি করলে রত্না আমায় ক্ষমা করবে না। বলুন, কি জানতে চান — যদি আমার ক্লায়েন্টের কোন গোপন তথ্য ফাঁস না হয়ে যায়, আমি আপনাকে, বলব।

: আপনার ক্লায়েন্টের সব গোপন তথ্যই আমার জানা। কালীচরণ কেমন করে শালীচরণ হয়েছিলেন, কেমন করে জেলে গেলেন, ফিরে এসে কেমন করে বৈষ্ণব হলেন, এবং কেমন করে বর্তমানে বৈষ্ণবীকে নিয়ে বৃন্দাবনধামে হনিমুনে গেলেন—

সিংহমশাই চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিয়ে শুধু বললেন, আপনি জিনিয়াস মশাই! উনি বৃন্দাবনে গেছেন এটুকুই জানি, বৈষ্ণবী নিয়ে হনিমুনের কথাটা যে আমিও জানি না। ওঃ! রত্না যদি —

: শুনুন! আমি কোন গোপন তথ্য আদৌ জানতে চাইছি না। আমার প্রথম প্রশ্ন — আপনি শালীচরণকে দেখেছেন? একটা বর্ণনা দিতে পারবেন?

: হাঁ। বহুবার দেখেছি। দীর্ঘ দিনের আলাপ। তা বছর পনেরর কম নয়। ওঁর বর্তমান বয়স এই ধরুন বেয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ। মাথা নেড়া, গলায় কণ্ঠি, নাকে তিলক। মাঝারি গড়ন। দাড়ি নেই, গোঁফ আছে। গায়ের রঙ কালো। চোখে চশমা, বাঁ-হাতে একটা টিসট্-ঘড়ি[৩৯], ধুতি পাঞ্জাবি পরেন সাধারণত।

: কতদিন আগে তাঁকে শেষ দেখেছেন?

: মাস খানেক আগে। জেল থেকে ছাড়া পেয়েই এসেছিলেন। ঐ সময়েই তিনি এসে বলেন যে, হয়তো মাস কয়েকের মধ্যে দীর্ঘদিনের জন্য বাইরে যাবেন, তাই ভাড়া আদায়ের যে ব্যবস্থা ছিল সেটা যেন আমরা চালিয়ে যাই।

৩৭। 'বাই জোভ' : জোভ হল দেবগুরু বৃহস্পতির রোমান নাম। দিব্যি দিতে বহুল ব্যবহৃত। এমন কি আদালতেও। রবি ঠাকুরের 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা'য় 'বাই জোভ! লোকটাকে কেমন ঠেসে ধরেছিলুম' স্মর্তব্য।

৩৮। শ্রাগ : কাঁধ ঝাঁকানো। শরদিন্দু নিজে কোনো গল্পে শব্দটি ব্যবহার করেন নি। কাঁটা সিরিজে বহুবার ব্যবহৃত।

৩৯। টিসট্ ঘড়ি : Tissot Watch. ১৮৫৩ সালে লা লোকলে সুইজারল্যান্ডে বিলাসবহুল এই ঘড়ির ব্যবসা শুরু করেন। বর্তমানে The Swatch Group Ltd. এর অন্তর্গত। বিশ্বের বৃহত্তম এবং মহার্ঘ ঘড়ির কোম্পানি। গল্পের সময়কালেও টিসট ঘড়ি খুব বড়োলোকেরাই পড়তে পারতেন।

৫.

দিনসাতেক পরে রাত্রি আন্দাজ সাড়ে নয়টার সময় ব্যোমকেশ তার কেয়াতলা লেনের বাসার বৈঠকখানায় আলো নিবিয়ে নিমীলিত নেত্রে আরাম-কেদারায় বসে ধূমপান করছিল। কদিন ধরে বিশুপালের ভূত যেন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। ক্রমাগত মনে মনে সে ঘটনা-পরম্পরা যাচাই করে চলেছে। এজাহারের নথীটা আর একবার দেখতে পারলে হত — তাতে যে অসঙ্গতির একটা ইঙ্গিত বিদ্যুত চমকের মত একবার জেগে উঠেই ওর মগ্নচৈতন্যে ডুব দিয়েছে, তার আর পাত্তা নেই। অসঙ্গতিটা কার জবানীতে, কি কারণে ঘটেছিল তা আর মনে করতে পারছে না, অথচ বেশ মনে পড়ছে যা হবার নয়, তাই বলেছিল এজাহার দানকারী। সেবার সেই নিরুপমা হোটেলের 'রুম নম্বর দুই'-এর হত্যা-তদন্তের সময় সেই লেডি-ডাক্তার ভদ্রমহিলা জেরার মুখে যেমন বেফাঁস বলে ফেলেছিলেন 'ও মুখ একবার দেখলে আমি ভুলতাম না'; কিম্বা সেই ঝানু রিটায়ার্ড দারোগা সেবার যেমন বেফাঁস বলে ফেলেছিলেন হাসির মায়ের নাম 'অমলা' (অচিন পাখি)[৪০]। এবারও তেমনি কে-যেন একটা অসঙ্গত উক্তি করেছে, যেটা মনে পড়লেই প্রকৃত অপরাধীকে চিহ্নিত করা যাবে! হয়তো দ্বিতীয়বার নথীগুলো উল্টে-পাল্টে দেখলে কথাটা মনে পড়ত; কিন্তু মাধব দারোগার সঙ্গে সম্পর্কটা এত মধুর হয়ে উঠেছে যে, দ্বিতীয়বার ঐ জবানবন্দীর নথীর উপর চোখ বুলানোর সম্ভাবনা অতি অল্প। এ কয়দিন ব্যোমকেশ কারও সঙ্গে ভাল ভাবে কথা বলছে না। সত্যবতী অবশ্য এতদিনে এতে অভ্যস্ত। সে জানে, বিশুপালবধ যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দানের পূর্বে ব্যোমকেশের এই ব্যোমমার্গ-বিচরণ বন্ধ হবার নয়। রাত্রের রান্নাবান্না সেরে, সব ঢাকা দিয়ে বেচারি তাই একাই শোবার ঘরে একটা উপন্যাসের পাতা উল্টাচ্ছিল। অজিতও বাড়ি নেই। সে সারা দিনই বাইরে বাইরে কাটায় আজকাল; কখন আসে কখন যায় টেরই পাওয়া যায় না[৪১]।

সন্তর্পণে সদর দরজার একটি পাল্লা খুলে গেল। দেখা গেল, অজিতের মুণ্ডখানা সেই ফাঁকে অতি সন্তর্পণে প্রবেশ করল। ধ্যানস্তিমিতলোচন ব্যোমকেশ ইজিচেয়ারে নির্বিকল্প সমাধিগ্রস্ত — এ সত্যটা রাস্তার বাতির ম্লান আলোয় নজরে পড়ে। অজিত ঘরে প্রবেশ করে। আস্তে দরজাটা আবার ভেজিয়ে দেয়। পা টিপে টিপে অন্দরমহলের দ্বারের কাছাকাছি পৌঁচেছে এমন সময় যেন দৈববাণী হল : সাত দিনের মেয়াদ[৪২] শেষ হয়েছে অজিত। এবার তোমার স্বীকারোক্তিটা শুনতে চাই।

অজিত থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে। পিছন ফেরে। দেখে, একই ভঙ্গিতে, ব্যোমকেশ নিমীলিতনেত্রে আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে পড়ে আছে। তার দক্ষিণ হস্তের তর্জনী ও মধ্যমার যাঁতাকলে বাঁধা পড়ে প্রচুর ছাই নিয়ে একটি সিগ্রেট প্রহর গুণছে। পুঞ্জীভূত ভস্মের তলায় আগুনটা ধিকিধিকি জ্বলছে ঠিকই।

অজিত সুইচটা টিপে দিতেই একঝলক বিজলীবাতির আলোয় ঘরটা খুশিয়াল হয়ে ওঠে। সামনের চেয়ারটায় বসতে বসতে সপ্রতিভভাবে অজিত বলে, ও হো! তুমি ঐ অন্ধকারে একা বসেছিলে বুঝি?

: কথা ঘোরাবার চেষ্টা কর না অজিত। আমি যে এখানে আছি তা তুমি বিলক্ষণ জানতে, না হলে পা-টিপে টিপে অন্দরমহলে ঢুকবার চেষ্টা করতে না। আমি আগেই বলেছি, তোমার কার্যকলাপ গতিবিধি ক্রমশই সন্দেহজনক হয়ে উঠছে। তা তুমি তখন সাত দিনের মেয়াদ চেয়েছিলে। সেই সাতদিন অনেক আগেই শেষ হয়েছে। এবার বল, তোমার মতলবটা কী! সারাদিন কী কর? কাক-ডাকা ভোরে বেরিয়ে যাও আর পেঁচা-ডাকা মাঝরাত্রে ফিরে আস। ব্যাপারটা কী?

অজিত মরিয়া হয়ে এক নিঃশ্বাসে বলে বসে : একটা লার্নার্স লাইসেন্স করিয়েছিলাম, বুঝলে? আজ পরীক্ষা দিলাম। পাশ করেছি। এবার পুরোপুরি লাইসেন্স পাব।

: 'লাই' পাচ্ছ সত্যবতীর কাছে, সেটা জানি, কিন্তু 'সেন্স' কি তোমার কোন দিনই হবে না? লাইসেন্স নিয়ে হবেটা কি? গাড়ি পাবে কোথায়?

অজিত একগাল হেসে বলে, তোমাকে খুলেই বলি ভাই। বইয়ের দোকানের ব্যবসা যে ভাল চলছিল না তা তো তুমি জানই। আমি একটা ট্যাক্সির পারমিটের ধান্দায় ছিলাম —

: ট্যাক্সি চালাবে। তুমি! সাহিত্যসেবা ছেড়ে দিয়ে? — এতক্ষণে সোজা হয়ে বসে ব্যোমকেশ। তার চোখ দুটি খুলে যায়।

: না হে না। আগে সবটা শোন। হঠাৎ একেবারে ছপ্পড় ফুঁড়ে আমার বরাৎ খুলে গেছে। তুমি সত্যবতীর হাত দেখে বলেছিলে[৪৩], তার কপালে মটোরগাড়ি নেই। বাড়ি হবে, তবে গাড়ি চড়া সত্যবতীর হবে না। সেই ভবিষ্যৎ-বাণী ব্যর্থ করতে আমি ট্যাক্সি কিনবার তালে ছিলাম। গাড়ি

৪০। অমলা (অচিন পাখি) : দারোগার এজাহারে তার হাসির মায়ের নাম জানা সম্ভব ছিল না। তাও ব্যোমকেশ প্রশ্ন করায় তিনি উত্তর দেন হাসির মায়ের নাম অমলা। ফলে ব্যোমকেশ তাকেই সন্দেহ করে।

৪১। টেরই পাওয়া যায় না : বিশুপাল বধ-এ শরদিন্দুর ব্যোমকেশ বড়ো নিষ্ঠুর ভাবে বলেছে, 'অজিতের হৃদয়ে প্রেম নেই। আছে কেবল অর্থ লিপ্সা।' হয়তো পুস্তক ব্যবসায় অজিতের ডুবে যাওয়াটা ভালোভাবে মেনে নেয়নি ব্যোমকেশ।

৪২। মেয়াদ শেষ হয়েছে অজিত : শরদিন্দুর বিশুপাল বধ-এ পাই — 'ব্যোমকেশ বলল, 'তোমার কার্য-কলাপ গতিবিধি ক্রমেই সন্দেহজনক হয়ে উঠছে। বিকাশকে ডেকে তোমার পিছনে টিকটিকি লাগাতে হবে দেখছি।'

'সাতদিন ধৈর্য ধরে থাকো, তারপর আমি নিজেই সব বলব।' অজিত বেরিয়ে গেল।'

৪৩। হাত দেখে বলেছিলে — ফলিত জ্যোতিষে অগাধ বিশ্বাস ছিল শরদিন্দুর। তিনিই প্রতুলচন্দ্র গুপ্তকে এইকথা বলেছিলেন। নারায়ণ সান্যাল ব্যোমকেশের মুখে শরদিন্দুর কথাই বসিয়ে দিয়েছেন। আগে ব্যোমকেশকে হাত দেখতে দেখা যায়নি।

চড়াও হবে, আবার রোজগারও হবে। কিন্তু 'গড্ হেল্‌পস্ দোজ হু হেল্প্ দেম্‌সেল্‌ভস্[৪৪]।' পরম করুণাময় ঈশ্বর সত্যবতী ও অজিতের যৌথ প্রার্থনায় বিগলিত হয়ে একখানা আনকোরা গাড়ি আমাদের উপহার দিচ্ছেন। ট্যাক্সি নয় — বাড়ির গাড়ি। ফিয়াট ইলেভ্‌ন-হান্ড্রেড[৪৫]।

: মানে! লটারীর টাকা পেলে নাকি?

অজিতের গোঁফ নেই, না-কামালে যে-খানে সেটা থাকার কথা ওষ্ঠের সেইখানকার বর্ম চুম্‌রিয়ে অজিত বলল, ভাগ্য নয়, রীতিমত পুরুষকার।-উপার্জন!

এর চেয়ে বিশুপালের হত্যারহস্যটা যে সরল! সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের বুদ্ধির লগি পর্যন্ত এখন 'একবাম মেলে না[৪৬]!' দুই বন্ধুর কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে ইতিমধ্যে সত্যবতীও ও-ঘর ছেড়ে উঠে এসেছে। শেষ দিককার কথোপকথন কর্ণগোচর হয়েছিল তার। সে গুটি গুটি এসে বসে পড়ে অজিতের পাশে। ব্যোমকেশ চোখ পাকিয়ে বলে, কি ব্যাপার? তুমি আবার উঠে এলে কিসের গন্ধ পেয়ে?

: পেট্রোলের! — বললে সত্যবতী এক গাল হেসে।

চারচাকার নূতন ফিয়াট গাড়িটা কেয়াতলা লেনের[৪৭] সদর দরজায় হাজির করে রহস্যটা ফাঁস করার ইচ্ছে ছিল অজিতের— ঠিক যে ভঙ্গিতে ব্যোমকেশ যবনিকা পাতের পূর্বমুহূর্তে তার ট্রাম্প-কার্ডখানা টেবিলে পাড়ে। কিন্তু দ্বি-মুখী সাঁড়াশী আক্রমণে এখন বেচারীকে আত্মসমর্পণ করতে হল। সত্যবতীর গাড়ির সখ অনেক দিনের। কেয়াতলায় বাড়ি করার পর থেকেই। ব্যোমকেশের বহু বন্ধুবান্ধব এবং বিশেষ করে প্রতুলবাবু ওকে এবার একটি গাড়ি কিনতে বলেছেন — 'সত্যবতীর এই সখটা এখন ব্যোমকেশের মিটিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু ব্যোমকেশ কিছুতেই রাজি হয়নি। তার যুক্তিটা : ছয়-সাত হাজার টাকায় সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি হয়তো একখানা কেনা যায়। কিন্তু তারপর? চালাবে কে? ড্রাইভার রাখতে গেলে ঢাকের দায়ে মনসা বিকিয়ে যাবে[৪৮]। মাথায় টাক অথচ চিবুকে লম্বা দাড়ি — এ বড় অশোভন।' কিন্তু অজিতও নাছোড়বান্দা। সে প্রতিজ্ঞা করেছে — ব্যোমকেশের ভবিষ্যদ্বানী সে ব্যর্থ করবেই। কাউকে কিছু না জানিয়ে প্রথমেই সে একটা লার্নার্স লাইসেন্স করিয়ে ছিল। একটা ড্রাইভিং ট্রেনিং স্কুলের সঙ্গে ব্যবস্থা করে গত কয়েকদিন ক্রমাগত লেকের চারিপাশে পাক মেরে সে-পাড়ার শারমেয়কুলকে সচকিত করে তুলেছে। উদ্যোগী পুরুষের ভগবান সহায়। হঠাৎ অজিতের নামে ডাকে একখানা চিঠি এল। বোম্বাই থেকে। খাম খুলে অজিত তো তাজ্জব! ব্যোমকেশের কীর্তিকাহিনী সমন্বিত একটি গোয়েন্দা কাহিনীর চিত্রস্বত্ত্ব ক্রয় করতে ইচ্ছুক হয়েছেন এক বোম্বাই-মার্কা চিত্র প্রযোজক। তিনি জানতে চেয়েছেন, ঐ কাহিনীর চিত্রস্বত্ত্ব অজিতের হাতে মজুত কি না, এবং থাকলে কী-পরিমাণ অর্থমূল্যে সে সেটা বিক্রয় করতে প্রস্তুত। অজিত পত্রপাঠ জবাব দিয়েছিল, চিত্রসত্ত্ব তারই বটে এবং অর্থ নয়, একটি ফিয়াট গাড়ির বিনিময়ে সে ঐ সত্ত্ব বিক্রয় করতে প্রস্তুত। সিনেমা-লাইনের কান্ডকারখানাই আলাদা। প্রত্যুত্তরে বোম্বাইমার্কা প্রযোজক এক রামপট টেলিগ্রাফ ঝাড়লেন। তিনি ঐ শর্তে চিত্রসত্ত্ব ক্রয়ে প্রস্তুত। তবে অজিতকে কাহিনীর একটি সংক্ষিপ্ত ইংরাজি 'সিনপ্‌সিস্' বা চুম্বকসার তৈরী করে দিতে হবে। 'সিনারিও' সম্বন্ধেও লেখকের সঙ্গে আলোচনা করা দরকার। তাই প্রযোজক তাঁর টেলিগ্রাফে জানিয়েছেন — তাঁর কলকাতাস্থিত প্রতিনিধি অজিতের সঙ্গে অনতিবিলম্বে দেখা করবে এবং প্লেনের টিকিট কেটে দেবে। অজিত যেন প্রস্তুত থাকে। অজিত বোম্বাই পৌঁছে কন্ট্রাক্টে সই করবে এবং সেখানেই গাড়িটা 'ডেলিভারী' নেবে!

সংবাদ শুনে একেবারে লাফিয়ে ওঠে সত্যবতী : এ্যাঁ! এতবড় খবরটা তুমি চেপে রেখেছিলে কি করে! আশ্চর্য মানুষ বাপু তোমরা! সবাই সমান! দাঁড়াও, আমি এখনই মিষ্টি আনতে দিই।

অজিত তার চাদরের তলা থেকে এক প্যাকেট সন্দেশ বার করে বলে, আজই এ সন্দেশটা পরিবেশন করব ভেবেছিলাম।

ব্যোমকেশ মনে মনে যতই খুশি হ'ক, মুখে সে ভাব প্রকাশ পেল না। গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললে, উঁহু! এমন তো হবার কথা নয়! সত্যবতীর কোষ্ঠীতে বাড়ি আছে, গাড়ি নেই! আমি ওর কোষ্ঠীবিচার করে দেখেছি[৪৯]!

: আরে রাখ তোমার কোষ্ঠীর ফলাফল! — অজিত মিষ্টির প্যাকেট থেকে একটা ম্যাগনাম সাইজ[৫০] কড়াপাক ব্যোমকেশের মুখবিবরে ফেলে দেয়। ব্যোমকেশ যে তার ফলিত-জ্যোতিষের গণনা ব্যর্থ হওয়ায় খুব কিছু মর্মাহত হয়েছে এমন মনে হল না। সে হৃষ্টমনে কড়াপাককে মিহি করে তুলতে থাকে চর্বনের মাধ্যমে।

দিন তিনেক পরে ফোলিও ব্যাগে ছাপা বই-এর কপি ও আনুষঙ্গিক নথীপত্র নিয়ে অজিত বোম্বাই রওনা হয়ে গেল। আকাশমার্গে যাওয়ায় সত্যবতীর কিছুটা আপত্তি ছিল। কিন্তু অজিত

৪৪। গড্ হেলপস্ দোজ : God helps those who helps themselves. এর উৎস গ্রীক সাহিত্যে, ৪০৯ খ্রিঃ পূঃ রচিত কিলকটেটিস্-এ সোফোক্লিস লেখেন, "No good ever comes of leisure purposeless; And heaven never helps the man who will not act." ৪২৮ খ্রিঃ পূর্বাব্দেও ইউরিপিডিসের 'হিপোলাইটাস'-এ পাই, "Try first thyself, and after call in God; for to the worker God himself lends aid." কোরানেও ১৩:১১ অধায়ে আছে, "Indeed, Allah will not change the condition of people untill they change what is themselves."

৪৫। ফিয়াট ইলেভেন হান্ড্রেড : ইতালিয়ান গাড়ির কোম্পানি। ১৯৩৭ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত এরা ফিয়াট ১১০০ মডেলটি ভারতে রপ্তানি করেন। জিওভানি এ্যাগনেল্লি Fabrica Italiana Automobili Torino (F.I.A.T) কোম্পানিটি প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৯৯)।

৪৬। একবাম মেলে না : 'এক বাঁও মেলে না' — প্রবাদের নারায়ণী পরিবর্তন।

৪৭। কেয়াতলা লেনের : ১৯৬৫-র মধ্য নভেম্বরে ঘটা নরেশ-গঙ্গাপদর কেসে শরদিন্দু লিখছেন 'ব্যোমকেশরা প্রায় মাস ছয়েক হলো কেয়াতলার নতুন বাড়িতে এসেছে।' ফলে ১৯৬৫-র মে মাস নাগাদ উত্তর কলকাতা ছেড়ে পাকাপাকিভাবে এই বাড়িতে চলে আসে তারা।

৪৮। ঢাকের দায়ে মনসা : প্রচলিত প্রবাদ ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রি। মনসা পুজোর ঢাকের বাদ্যির খরচ যোগাতে মনসা ঠাকুরকেই বিক্রি। অর্থাৎ আসল অপেক্ষা আনুসঙ্গিক খরচ বেশি।

৪৯। কোষ্ঠি বিচার করে দেখেছি : আবার ব্যোমকেশের কণ্ঠে শরদিন্দুর কথা শোনা যাচ্ছে। টিকা ৪৩ দ্রষ্টব্য।

৫০। ম্যাগনাম সাইজ : খুব বড়ো আকারের। বাইবেলের এক রাজার নাম। পানীয় বিশেষ করে শ্যাম্পেনের বোতলের আকৃতিতে Magnum size ব্যবহৃত। Magnum মানে দেড় লিটার।

শুনল না। বলল, তা কি হয়? এখন থেকে আমি ভি.আই.পি.! ব্যোমকেশবাবু অতঃপর ব্যোমমার্গেই যাতায়াত করবেন।

ব্যোমকেশ ব্যোমমার্গে দৃষ্টিপাত করে বলেছিল, আঙ্গুল ফুলে যাদের কলাগাছ হয় তাদের খেয়াল রাখা উচিত কলার ফুল একবারই ফোটে!

অজিতও দৃঢ় প্রতিবাদ করেছিল সত্যবতীকে সালিশ মেনে, কলাশিল্পের চর্চা না করে যারা চোর-ছ্যাঁচড়ের পিছনে ঘুরে বেড়ায় তাদের খেয়াল রাখা উচিত যে, কলাগাছ যেখানে জন্মায় সেখানে সারি সারি জন্মায়।

মোটকথা অজিত বিজয়ী বীরের মত রওনা হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে ব্যোমকেশ 'বিশুপাল বধ' রহস্যের আরও কিছুটা সংবাদ সংগ্রহ করছে। 'কীচক-বধ' পালা বন্ধ আছে। অভিনয় আর হচ্ছে না। ডাক্তার অমল পাল এসে থিয়েটারের দখল নিয়েছে। কেউ আপত্তি করেনি। অমল সকলকে জানিয়ে দিয়েছে, সকলে যে-যেমন মাহিনা পাচ্ছিল তাই পাবে — অভিনয় হোক আর নাই হোক। আদালত থেকে সাক্সেশন্- সার্টিফিকেট পেলেই সে সকলের বকেয়া মাহিনা চুকিয়ে দেবে। মণীশ ভদ্র সস্ত্রীক পদত্যাগ পত্র দাখিল করেছে, কিন্তু অমল তা গ্রহণ করেনি। বলেছে, কোর্ট-কাছারির হাঙ্গামা না মিটলে সে কিছুই বলতে পারবে না। নূতন একটি নাটকের মহড়াও বসছে। নাটকটির নির্বাচন বিশু পালই করেছিল, নাম-ভূমিকায় তার অভিনয়ের কথাও ছিল। অমল সে-চরিত্রটা ব্রজরাখালকে দিয়েছে। নূতন দু-একজন অভিনেতার সন্ধানেও আছে সে। প্রতিদিন অফিসে এসে বসে, কাগজপত্র দেখে। পাওনাদারদের ঠেকিয়ে রাখে সাকসেশন্-সার্টিফিকেটের নাম করে। অভিনয় হয় না, তবে রিহার্সাল চলে। ব্রজরাখালের স্ত্রী এসে নূতন গানে সুর লাগায়, মালবিকা পার্ট মুখস্ত করে, কাঞ্চন বাতি ধরে টানাটানি করে আর প্রম্পটার কালীবাবু তোৎলামি করে।

এর ভিতর আবার একদিন শালীচরণের বাসাতে গিয়েও ঢুঁ দিয়েছে। শালীচরণ তীর্থদর্শন, তথা হনিমুন সেরে তখনও ফেরেনি। দ্বিতলবাসী ভাড়াটিয়া বিজয়বাবু ব্যোমকেশকে দ্বিতীয়বার দেখে কৌতূহলী হয়ে নেমে এসেছিলেন। বলেন, কী ব্যাপার বলুন তো মশাই? শালীচরণকে টাকা হাওলাৎ দিয়েছিলেন নাকি?

ব্যোমকেশ সত্যমিথ্যা এড়িয়ে বললে, আর বলেন কেন! গ্রহের ফের!

বিজয়বাবু বলেন, তাহলে টাকা আদায় করতে বেশ বেগ পেতে হবে। মনে হচ্ছে শালীচরণ বিশেষ প্রয়োজনে গা-ঢাকা দিয়েছেন। সেদিন পুলিশ এসেছিল!

ব্যোমকেশ ছদ্মবিস্ময়ে আঁৎকে ওঠে, পুলিশ! যারা ছুঁলে আঠারো ঘা হয়! কেন? পুলিস কেন?

: কেন, তা কেমন করে জানব? পুলিস শুধু প্রশ্নই করে, জবাব দেয় না। ওঃ! সেদিন জেরার চোটে আমার জেরবার করে দিয়েছিল! এই তো গতকাল এল পুলিস ইন্সপেক্টর আমার চিঠি আর রসিদগুলো ফেরত দিয়ে গেলেন।

: চিঠি মানে? কার চিঠি?

: আসুন মশাই, ওপরে এসে বসুন। এমন পথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি এসব কথা হয়?

অগত্যা ব্যোমকেশ বিজয়বাবুর পিছন পিছন দ্বিতলে উঠে এসে তাঁর বৈঠকখানায় বসেছিল। এক এক তলায় তিনখানি ঘর। পাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে। দ্বিতলবাসী একেবারে রাস্তা থেকেই তাঁর ডেরায় যেতে পারেন। একতলাবাসীর সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই সেদিক থেকে। বৈঠকখানা ঘরটি ছোট। এক পাশে একটি কাঠের টেবিল ও চেয়ার, ওপাশে একটি জলকে চৌকি — মাথার কাছে কালীঘাটের মায়ের ছবি। চৌকিতে সতরঞ্চি বিছানো, তোষক-বালিশ গোটানো আছে, মা-কালীর পায়ের নিচে। বিজয়বাবু ব্যোমকেশকে চেয়ারখানা এগিয়ে দিয়ে নিজে চৌকিতে চেপে বসলেন। ব্যোমকেশ বললে, চিঠির কথা তখন কি-যেন বলছিলেন? কার চিঠি?

: আমাদের বাড়িওয়ালা বোষ্টমের, আবার কার? বৃন্দাবন থেকে লেখা। দেখবেন?

: আপনার যদি আপত্তি না থাকে।

: আপত্তি আবার কিসের? উনি তো আমাকে কিছু প্রেমপত্র লেখেননি। দেখুন না। পুলিসেই যখন দেখেছে তখন আর আপনার দেখায় আপত্তি কিসের?

বিজয়বাবু অতঃপর টেবিলের দেরাজ থেকে একটি পোস্টকার্ড বার করে ব্যোমকেশের হাতে দিলেন। ব্যোমকেশ আলোর দিকে সরে এসে গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে সেটা পরীক্ষা করতে থাকে। পোস্টকার্ডে বৃন্দাবন পোস্ট অফিসের ছাপটা পড়েছে সুস্পষ্টভাবে। তারিখও পড়া যাচ্ছে :

অহর্নিশের জন্য ব্যোমকেশ বক্সীকে মূর্ত করলেন শিল্পী দেবাশীষ দেব

৩১.৮.৭০। অর্থাৎ বিশু পাল খুন হওয়ার পরের দিনের তারিখ। কলকাতা ডাকঘরের ছাপটা অস্পষ্ট। নীল কালিতে গোটা গোটা হরফে লেখা :

শ্রীগুরুধাম আশ্রম
১৭নং মহাপ্রভু রোড
নিত্যানন্দ পাড়া
বৃন্দাবন—৩
৩১.৮.১৯৭০

'শ্রদ্ধাস্পদেষু,

বিজয়বাবু, অদ্যপ্রাতে আমরা দুইজনে ১০৮ শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের কৃপায় নিরাপদে শ্রীশ্রীবৃন্দাবনধামে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। গাড়িতে কোন কষ্ট হয় নাই। আগামী কল্য এ আশ্রমে মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছে। শতাধিক অতিথি নারায়ণের সেবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আগামী শুক্রবার আমরা দুজনে এ-স্থান হইতে মথুরা যাত্রা করিব। কখন কোথায় থাকিব স্থির নাই। সম্প্রতি ফিরিবারও বাসনা নাই। মেসার্স সিংহ-রায় পূর্বের মত আমার তরফে ভাড়া আদায় করিয়া যাইবেন, সে-কথা তো বলিয়াই আসিয়াছি। জলের পাম্প গণ্ডগোল করিলে কৈলাস-মিস্ত্রিকে সংবাদ দিবেন। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের কৃপায় আপনারা আশাকরি কুশলে আছেন। আমাদের যুগল-প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি

বিনয়াবনত
কালীচরণ দাস।'

ব্যোমকেশ বলে, বিজয়বাবু এই বিনয়াবনত জীবটির হাতের লেখা আপনি চেনেন তো?

বিজয়বাবু একটি বিড়ি ধরিয়ে বিজ্ঞের হাসি হেসে বললেন, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। এ চিঠি বাড়িয়ালা বোষ্টমেরই লেখা। আমি কেমন করে জানলাম, ভাবছেন তো? আমাকে ঐ পুলিস-ইন্সপেক্টার সাহেব নিজেই বলে গেছে। তিনি ঐ পোস্টকার্ডখানা আর খান কয়েক পুরানো বাড়িভাড়ার রসিদ আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। গতকাল সেগুলি ফেরত দেবার সময় নিজে থেকেই বললেন, বাড়িওয়ালা বৃন্দাবনেই আছেন। কারণ উনি বিশেষজ্ঞকে দিয়ে পরীক্ষা করে জেনেছেন — হাতের লেখা একই লোকের!

যা জানবার ছিল তা জানা হয়ে গেছে। বিশুপাল বধের সঙ্গে দশপনের বছর পূর্বেকার একটি মর্মান্তিক ঘটনার কোন যোগাযোগ আছে কি না জানবার উদ্দেশ্যেই ব্যোমকেশ এসেছিল শালীচরণের সন্ধানে। দুই দশকের দুটি ঘটনাই 'কীচকবধ' ধর্মী। তাই ওর মন বলছিল — যোগাযোগ থাকলেও থাকতে পারে, বিশেষ শালীচরণ যখন মাসখানেক আগে ছাড়া পেয়েছে। কিন্তু এখন সে চিন্তায় যবনিকাপাত ঘটল। সমস্ত পরিস্থিতিটা এখন নূতন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করতে হবে।

৬.

আরও দিন সাতেক পরের কথা। প্রতুলবাবু সকালবেলা খবরের কাগজটা কোনক্রমে শেষ করে তাঁর বৈঠকখানায় এক রাশ পরীক্ষার খাতা টেনে নিয়ে বসেছিলেন। আজ কদিন তিনি খাতা দেখেননি। এদিক থেকে প্রতুলবাবু খুব নিষ্ঠাবান পরীক্ষক। নিজের মন চঞ্চল থাকলে পরীক্ষার্থীদের প্রতি সুবিচার নাও হতে পারে। তাই কদিন খাতা দেখেননি। প্রায় দিন দশেক পুলিসের উপদ্রব না হওয়ায় এতদিনে মনের সাম্য ফিরে পেয়েছেন। তাই আজ বসেছিলেন খাতার বাণ্ডিল নিয়ে। হঠাৎ চাকরটা এসে জানালো — একজন দারোগাবাবু দেখা করতে চান! প্রতুলচন্দ্রের মনটা বিষিয়ে ওঠে। চাকরটাকে কি নির্দেশ দেবেন বুঝে উঠতে পারেন না। কিন্তু নির্দেশের অপেক্ষায় দ্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার পাত্র মাধব দারোগা নয়। সে পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে যুক্তকর কপালে ঠেকায় : আসতে পারি স্যার?

যে এসে পড়েছে তাকে আসবার অনুমতি দিতে যাওয়া বাহুল্য। যেসব ছাত্র প্রশ্নের আওতার অতিরিক্ত বাহুল্য জবাব লেখে অধ্যাপক প্রতুলচন্দ্র তাদের নম্বর কেটে নেন। ফলে তিনি আর কোন মুখে এ বাহুল্য প্রশ্নের জবাব দেবেন? মাধব মিত্র একখানা চেয়ার টেনে নেয়। 'বসতে পারি?' — এ বাহুল্য প্রশ্ন না করে চেপে বসে চেয়ারখানায়। বলে, সেদিন হয়তো আমার ব্যবহারে আপনি ক্ষুন্ন হয়েছিলেন স্যার, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার কোন অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না। নিতান্ত

কর্তব্যবোধেই আপনাকে প্রশ্ন করেছিলাম। সে যাই হোক, আমার সেদিনের ব্যবহারে যদি আপনি আহত হয়ে থাকেন তাহলে আমি ক্ষমা চাইছি।

দেবতুল্য ভালোমানুষ প্রতুলবাবু মাধব মিত্রের যুক্ত করতল ধরে ফেলে বলেন, বিলক্ষণ। এসব কী বলছেন মাধববাবু?

: না, মানে আপনার সঙ্গে যে আমাদের ডি.আই.জি মজুমদার সাহেবের এত খাতির আছে, তা আমি আদৌ জানতাম না।

: না, না। আমি তাঁকে চিনতামই না। ব্যোমকেশবাবু—

: ও! ব্যোমকেশবাবু! বুঝেছি। থাক। ব্যোমকেশবাবুর কথা থাক। তিনি সখের গোয়েন্দা। পুলিসের চাকরিতে যে কী-রকম ঝক্‌মারি তা তিনি কী বুঝবেন?

প্রসঙ্গ বদলাবার উদ্দেশ্যে প্রতুলচন্দ্র বলে ওঠেন, সে যাই হোক, 'বিশুপাল বধ' নাটকের কতদূর?

: যবনিকা আসন্ন। বিশু পালের হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া গেছে। সে-কথাই আপনাকে জানাতে এসেছি। এ নিয়ে আর কেউ আপনাকে বিরক্ত করতে আসবে না।

প্রতুলবাবু একেবারে লাফিয়ে ওঠেন, বলেন কি! খুনের কিনারা হয়ে গেছে! কে খুন করেছিল?

মাধব মিত্র বিচিত্র হেসে বললেন, মাপ করবেন স্যার, সে-কথাটা স্ট্রিক্‌লি কন্‌ফিডেন্সিয়াল। কে খুন করেছে, কেন খুন করেছে, সব আমরা জানতে পেরেছি। আপনি তো জানেন, এ পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। আজই সন্ধ্যায় সে কাজটা করা হবে। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আমার সঙ্গেই আছে।

প্রতুলবাবু উৎসাহিত হয়ে বলেন, তাহলে ব্যোমকেশবাবুকে একটা ফোন করা যাক।

মাধব মিত্র দাঁতে দাঁত চেপে কোন ক্রমে বললে, এসব সামান্য ব্যাপারে তাঁর মত সখের সত্যান্বেষীকে কেন বিরক্ত করা। তবে আপনাকে স্যার আসতে হবে। আজ সন্ধ্যা সাতটায় থিয়েটার 'হল'-এ। 'বিশু পাল বধ' নাটকের যবনিকা পাত স্বচক্ষে দেখে যাবেন।

: সন্ধ্যা সাতটায় কী হবে?

: আজ সন্ধ্যা সাতটায় আমি সকলকে থিয়েটারে উপস্থিত থাকতে বলেছি। সবাইকে আবার সম্মিলিতভাবে জেরা করতে চাই। প্রমাণ আমার হাতে আছে, কিন্তু কয়েকটি স্বীকারোক্তি সর্বসমক্ষে করিয়ে নিতে চাই। জানেন তো স্যার, আদালতে এই জাতের মার্ডার-কেসে গিল্‌টি-ভার্ডিক্টটা পাওয়া কী কঠিন। আপনি যদি স্যার, আজ সন্ধ্যা সাতটায় একবার থিয়েটার হল-এ পদধূলি দেন তাহলে আমার বিশেষ সুবিধা হয়।

: কেন? আমি কি-ভাবে সাহায্য করতে পারি?

: আপনি শুধু উপস্থিত থাকবেন। চোখ কান খোলা রাখবেন। কী ঘটছে তাই দেখে যাবেন। প্রয়োজনবোধে আপনাকে হয়তো আমরা ভবিষ্যতে সাক্ষ্য মানব। আপনি প্রসিকিউশানের তরফে সাক্ষী হলে কোন জজ-সাহেবই বলতে পারবে না—পুলিস মিথ্যা সাক্ষী খাড়া করেছে।

প্রতুলচন্দ্র বললেন, বেশ। এত করে বলছেন, যাব। তাহলে এবার একটু চায়ের আয়োজন করি।

: না স্যার। আজ থাক। আর একদিন এসে খেয়ে যাব। শুধু চা নয়, 'টা'ও! আজকে শুধু রাঘব-বোয়ালটাকে গেঁথে তুলতে সাহায্য করুন।

মাধব মিত্র চলে যেতেই প্রতুলবাবু টেলিফোনটা তুলে নিয়ে ব্যোমকেশের নম্বার ডায়াল করেন। টেলিফোন বেজেই গেল। একটু অবাক হলেন প্রতুলবাবু। এখন সকাল নয়টা। অথচ ওরা কেউই বাড়ি নেই? ব্যোমকেশবাবু, অজিতবাবু, অন্তত সত্যবতী? কিন্তু নাঃ! কেউই ধরল না। কিন্তু প্রতুলবাবুর অবস্থা তখন 'ভবম্ হাজাম'[৫১]-এর মত। এতবড় খবরটা কাউকে না বলে যেন তৃপ্ত হতে পারছিলেন না। অগত্যা পরীক্ষার খাতার বান্ডিলটা সরিয়ে রেখে গাড়ি নিয়ে বার হলেন।

কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! ব্যোমকেশের কেয়াতলার বাড়িতে মস্ত তালা ঝুলছে।

আবার বাড়িতে ফিরে এসে দেখেন ইন্সপেক্টার রাখাল সরকার তার অপেক্ষায় বসে। রাখালবাবু কেয়াতলা অঞ্চলের থানার দারোগা।

: কী ব্যাপার? রাখালবাবু— কি মনে করে?

: মহা বিপদে পড়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। ব্যোমকেশবাবু কবে ফিরছেন জানেন?

: ব্যোমকেশবাবু যে তাঁর বাড়িতে নেই সেই খবরটুকুই এইমাত্র জেনেছি। কিন্তু আপনিই বা তাঁকে এমন মর্মান্তিকভাবে খুঁজছেন কেন? আবার কেউ খুন হল না কি?

: আজ্ঞে না। সেই পুরানো বিশু পালের কেসটাই। এই দেখুন, আপনার বন্ধু কী ঝামেলা পাকিয়ে বসেছেন, দেখুন।

৫১। ভবম্ হাজাম : উত্তর ভারতে প্রচলিত লোককথার এক নাপিত। রাজার চুল কাটতে গিয়ে রাজার শিং দেখে ফেলে সে। ভয়ে কাউকে বলতে পারে না। ফলে তার পেট ফুলতেই থাকে। অসামান্য এই ছোটোদের গল্পটি বাংলায় প্রথম লেখেন কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, সন্দেশ প্রথম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

(শ্রাবণ ১৩২০)-তে (১১৯ পৃ.)। সঙ্গে সুকুমার রায়ের অসামান্য ইলাস্ট্রেশন। পরে এম. সি. সরকার প্রকাশিত 'জগন্নাথের খেয়াল খাতা'র অন্তর্ভুক্ত (মাঘ, ১৩৬২)।

রাখাল সরকার পকেট থেকে একটি আর্জেন্ট টেলিগ্রাফ বার করে দেখান। বৃন্দাবন থেকে ব্যোমকেশ টেলিগ্রাফ করেছে — ডি.আই.জি. মজুমদার সাহেবকে। বক্তব্য প্রাঞ্জল : বিশুপাল রহস্যের কিনারা হয়েছে। নয় জন সন্দেহভাজনের কেউ যেন না সট্‌কাতে পারে। শীঘ্রই আসছি।

তারবার্তাটা ফেরত দিয়ে প্রতুলবাবু বলেন, এ তো সুসংবাদ। ঝামেলা আবার কোথায়? মাধববাবুও এইমাত্র জানিয়ে গেলেন — হত্যাকারী কে, তা চূড়ান্তভাবে জানা গেছে। দু-জনেই নিশ্চয় একসঙ্গে সেটা জানতে পেরেছেন, যদিও আমার মাথায় এখনও ঢুকছে না — কি করে কী হল।

: কিন্তু ধরুন, ওঁরা দুজন যদি দুজনের দিকে আঙুল তুলে দেখান?

: সে-রকম হওয়ার আশঙ্কা আছে নাকি?

: বিচিত্র নয়। শুনুন বলি —

প্রতুলচন্দ্র অতঃপর রাখাল সরকারের কাছ থেকে কিছু গুহ্যতথ্য সংগ্রহ করেন।

ব্যোমকেশ, প্রতুলচন্দ্রের প্রতি দুর্ব্যবহার করায় ডি.আই.জি. সাহেব নাকি মাধব দারোগার প্রতি কিছু অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন। যদিও ঘটনা ঘটেছে মাধব মিত্রের এলাকায় তবু তিনি রাখাল সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন পৃথকভাবে তদন্ত করতে এবং সরাসরি ডি.আই.জিকে রিপোর্ট করতে। সেই বিশেষ আদেশ অনুসারে রাখাল সরকার কেসটা পৃথকভাবে তদন্ত করছেন। মাধব মিত্রের অধিকারে হাত না দিয়ে তিনি নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা অনুসারে আলাদাভাবে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করছেন এবং বড়সাহেবকে ওয়াকিবহাল রাখছেন। রাখালবাবু কর্তৃক সংগৃহীত তদন্তের ফলাফল নিম্নোক্তরূপ —

১) ঘটনার পর থেকে সুলোচনা দেবী শ্যামবাজার এলাকায় বিশু পালের বাড়িতে থাকছে না। সে থাকছে শ্যামপুকুর লেনে ব্রজদুলাল ঘোষের সঙ্গে।

২) ঐ শ্যামসুন্দর লেনে ব্রজদুলালের সংসারে এক বুড়ি পিসি থাকতেন। তিনি বৃন্দাবনতীর্থে যাত্রা করেছেন। তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়নি। ব্রজদুলালের স্ত্রী শান্তি নাকি কর্তার সঙ্গে রাগারাগি করে মেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেছে। কলহের হেতু — আন্দাজ করা যায় : সুলোচনা।

৩) রাখাল সরকার অতঃপর শান্তির সঙ্গে দেখা করে জানতে চেয়েছিলেন, কেন তিনি এভাবে বাপের বাড়ি চলে এলেন। শান্তি কোনও কৈফিয়ৎ দেয়নি। বলেছিল, এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। সে ও-প্রশ্নের জবাব দেবে না।

৪) শ্যামবাজারে বিশু পালের বাড়ি খানা-তল্লাশি করে কিছুই পাওয়া যায়নি; কিন্তু তার বাড়ির উল্টোদিকে ডাস্টবিন-এর গর্ভ থেকে উদ্ধার করা গেছে কয়েক খণ্ড ছেঁড়া কাগজ। কুচি কুচি করে ছেঁড়া কাগজের পাঠোদ্ধার করা যায়নি, তবে মনে হয় সেটি একটা উইল-এর খণ্ডিতাংশ — হস্তাক্ষর মৃত বিশু পাল-এর।

৫) মণীশ ভদ্রের আমাহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়ির মালিক জানিয়েছেন যে, তিনি ভাড়াটিয়া ভদ্র মশাইয়ের কাছ থেকে বাড়ি ছেড়ে দেবার নোটিশ পেয়েছেন। পয়লা অক্টোবর তিনি বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছেন।

সংবাদগুলি শুনে প্রতুলচন্দ্র বলেন, তথ্যগুলি বিচিত্র ধরণের, কিন্তু তা থেকে অনেকগুলি অনুসিদ্ধান্তে এসে পড়া যাচ্ছে। এর ভিতর অবশ্য চমকপ্রদ খবর কিছু নেই।

রাখাল সরকার বললে, চমকপ্রদ সংবাদও একটা আছে। এবার শুনুন — আন্তঃপ্রাদেশিক একটি বিবাহের কথা।

: সেটা কি রকম? — প্রতুলচন্দ্র উৎসাহিত হন।

রাখালবাবু তখন বলতে থাকেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা। একদিন সকালে থিয়েটার হলে গিয়ে রাখালবাবু দেখেন গলির মোড়ে প্রচন্ড বচসা হচ্ছে। বিশুদ্ধ দেহাতী হিন্দি এবং ওড্র-দেশীয় ভাষার সংমিশ্রন থেকে ব্যাপারটা তিনি প্রথমটায় বুঝে উঠতে পারেননি। পরে পুলিস দেখে দু-পক্ষই হঠাৎ তাদের ঝগড়া থামিয়ে ফেলে এবং রাখালবাবুকেই সালিস মানে। রাখাল জানতে পারেন, বিবাদের উৎপত্তি প্রভু সিং-এর ভগ্নিপতি শ্রীমান নিত্যানন্দ মহাপাত্রের আবির্ভাবে। প্রভু সিং ছাপরা জেলার বাসিন্দা, কিন্তু তার ভগ্নিপতি খাঁটি ওড়িয়া। ভুবনেশ্বরে এক কারখানার কর্মী। সোমরিয়াকে নিয়ে নিত্যানন্দ ইতিপূর্বে ভুবনেশ্বরেই ছিল সেখানকার একটা কুলিবস্তিতে। স্ত্রীর সঙ্গে বচসা হওয়ায় কোন এক শনিবার সে সপ্তাহান্তের সবটুকু উপার্জন তরল অবস্থায় গলাধকরণ করে ধর্মপত্নীর পৃষ্ঠদেশে একখণ্ড জ্বালানী কাষ্ঠ দ্বিখণ্ডিত করে। সে-রাত্রেই নাকি সোমরিয়া পুরী প্যাসেঞ্জার ধরে কলকাতায় চলে আসে এবং প্রভু সিং-এর আশ্রয় নেয়। তদন্তে আরও প্রকাশ পায় মহাপাত্রের ধর্মপত্নী আদৌ প্রভু সিং-এর সহোদরা নয়, গ্রাম সম্পর্কে তারা ভাই-বোন। মহাপাত্র সম্প্রতি জানতে পেরেছে যে, প্রভু সিং ও তার স্ত্রী সোমরিয়াকে দিয়ে ঠিকে ঝিয়ের কাজ করাচ্ছে। মহাপাত্রের

জাত্যাভিমান অত্যন্ত প্রখর — সে ভালবেসেই সোমরিয়াকে একদিন বিবাহ করেছিল, স্ত্রীকে দিয়ে ঝিয়ের কাজ করানো হচ্ছে শুনে সে কলকাতায় ছুটে এসেছে। বউকে সে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। প্রভু সিং-এর তাতে ঘোরতর আপত্তি। সোমরিয়াও স্বামীর ঘরে ফিরে যেতে নারাজ। সবচেয়ে অবাক করা খবর এ বচসায় প্রভু সিং-এর পত্নীও মহাপাত্রের বিরুদ্ধপক্ষে চীৎকার করছে। সম্ভবত স্বামীর ঐ পাতানো বোনের মাধ্যমে তাদের সংসারে উপার্জন ভালই হচ্ছিল। এমনকি রাখালের মনে হল সোমরিয়া যে স্বয়ং মালিকের নেকনজরে আছে, এবং তাতে যে প্রভু সিং পরিবারের সমূহ লাভ এ তথ্যও জানা আছে প্রভুপত্নীর। রাখাল সরকার সব বৃত্তান্ত শুনে নিত্যানন্দ মহাপাত্রকে বলেছিল, প্রভু সিং এর মালিক খুন হয়েছেন। পুলিস অনুসন্ধান চালাচ্ছে। এমতাবস্থায় মহাপাত্র এ বিষয়ে নাক গলালে হঠাৎ তার নাকেই দড়ি পড়তে পারে। এ ঝামেলা মিটে গেলে মহাপাত্র যদি তার স্বামীত্বের দাবি নিয়ে হাজির হয় তাহলেই তার পক্ষে মঙ্গল। এ সংবাদে নিত্যানন্দ মহাপাত্র একটু থমকে যায়। রাখাল সরকার তখন তার ওড়িয়াভাষার সীমিতজ্ঞানে যোগ করে দেয় রাজশেখর বসুর একটি অনবদ্য উদ্ধৃতি : "ও পাকে যিব তো ডান্ডা খিব[৫২]!" এ উদ্ধৃতিতে মন্ত্রের মতো কাজ হয়। মহাপাত্র তৎক্ষণাৎ পশ্চাদপসারণ করে, দারোগাবাবার পরামর্শে তার অক্ষত নাসিকা নিয়ে দেশে ফিরে যায়। শাসিয়ে যায় অনতিবিলম্বে সে ফিরে আসবে এবং চুলের মুঠি ধরে সোমরিয়াকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। প্রভু-শালাকে সে দেখে নেবে!

সমস্ত বিবরণ শুনে প্রতুলচন্দ্র বলেন, এটা চমকপ্রদ খবর বটে।

: না স্যার, ক্লাইম্যাক্সটা এখনও বলিনি। প্রভু সিং-এর বিশুদ্ধ ছাপরাই ভাষণ এবং মহাপাত্রের ওড্রদেশীয় হুঙ্কারের মাঝে মাঝে আমি আ-মরি বাঙলাভাষার কিঞ্চিৎ লঙ্কা-ফোড়নও শুনেছি — 'আ মর্ -মিন্‌সে!' 'মুখে নুড়ো জ্বেলে দেব' ইত্যাদি। আর সেই ফোড়নের শব্দ এসেছে শ্রীমতী সোমরিয়ার কণ্ঠ থেকে! সোমরিয়া নির্ভেজাল বাঙালিনী!

: বলেন কি! ওর সাজ পোষাক, হাবভাব দেখে আমরা যে ভেবেছিলাম ছাপরা-জেলার মেয়ে! কিন্তু সে যাই হোক, এ থেকে কেন মনে করছেন যে, মাধববাবু এবং ব্যোমকেশের সিদ্ধান্ত ভিন্নমার্গী হবে?

: আমার বিশ্বাস মাধববাবু এই সিদ্ধান্তে এসেছেন — সুলোচনার কোনও আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে বিশু পাল উইল পালটাবার মতলব করে। অমল পালকে সঙ্গে নিয়ে সে সলিসিটার অফিস থেকে উইলখানা ফেরত নিয়ে আসে। অমল পাল আগের উইলখানার কথা জানত, তাকে বিশু বাবু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন। নূতন উইলেও অমল পালের প্রাপ্তিযোগ এমন কিছু কম হত না; কিন্তু অমল পালের থিয়োরি বোধকরি — নাল্পে সুখমস্তি[৫৩]! নগদ, শেয়ার আর কোম্পানির কাগজে সে সন্তুষ্ট থাকতে পারল না। সে ভেবে দেখল, নূতন উইল করার পূর্বেই যদি বিশু পালের মৃত্যু হয়, তাহলে গাড়ি ও থিয়েটারের মালিকানা তার উপর বর্তাবে। উইলহীন বিশু পালের সেই একমাত্র আইনসঙ্গত ওয়ারিশ। সে ব্রজরাখালকে দলে টানল। ব্রজরাখালকে জানতে দিল না যে, সিংহ-রায় ফার্ম থেকে উইলখানা ফেরত নেওয়া হয়েছে। ব্রজরাখাল সুলোচনাকে পেয়েছে, গাড়ি-সমেত পেলে সে আরও খুশী হয়, তার উপর ইন্সিওরেন্সের মোটা টাকার লোভও অছে এবং সর্বোপরি সুলোচনা এতদিন হাতছাড়া হওয়ায় হয়তো তার একটা প্রচন্ড চাপা রাগও ছিল। ফলে অমল ও ব্রজরাখাল মিলে এ কাজটা করেছে। ডাক্তার অমল পালের পক্ষে হায়ড্রোসায়ানিক এ্যাসিডের এ্যাম্পুল সংগ্রহ করা কঠিন কাজ নয়, যেমন কঠিন নয় ব্রজরাখালের পক্ষে অন্ধকারে কাজ হাসিল করা। পরে অমলই উইলখানা ছিঁড়ে ফেলে এবং ডাস্টবিনে ফেলে আসে।

প্রতুলচন্দ্র বললেন, আপনি যা যা বলছেন তা তো যুক্তিসঙ্গত। এমনটি হওয়াই তো সম্ভব। কোন অসঙ্গতি তো আমার নজরে পড়ছে না।

: আমার কিন্তু পড়ছে। প্রথম কথা, ব্রজরাখাল সেক্ষেত্রে কিছুতেই বিশু পালের কণ্ঠনালী এত জোড়ে চেপে ধরত না, যাতে তার শ্বাসরোধ হয়, অথবা গলায় আঙুলের দাগ থাকে। সে জানত এজন্য সন্দেহটা তার উপরেই বর্তাবে। তাছাড়া সে জানত, শেষ দৃশ্যে তাকে রীতিমত মল্লযুদ্ধ করতে হবে। ভঙ্গুর কাচের পাত্রে তরল হায়ড্রোসায়ানিক এ্যাসিড নিয়ে তার পক্ষে মল্লযুদ্ধ করা সম্ভব নয়। তৃতীয়ত, ব্রজরাখাল জানত, সুলোচনার মতি পদ্মপত্রের জল। সুলোচনা তারও বিবাহিত স্ত্রী নয়, তার প্রতি ইতিপূর্বেই সুলোচনা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ফলে সুলোচনা বিলাতী মটোর গাড়ি পেলে ব্রজরাখালের কোন চতুর্বর্গ লাভ হবে? সে বরং চাইবে শান্তির সঙ্গে অশান্তি না ঘটিয়ে আড়ালে-আবডালে সুলোচনা-মধু পান করতে। ফলে ব্রজরাখালকে অমল পালের সহকারীরূপে কল্পনা করা যাচ্ছে না।

৫২। ডান্ডা খিব : এই অসামান্য উক্তিটি রাজশেখর বসুর 'কজ্জলী' গ্রন্থের 'উলট পুরান' গল্পের অন্তর্গত। মূল উক্তিটি হল — 'কিন্তু উড়িয়া সার্জেন্টরা তাদের অপমান করিয়া বলিয়াছে — এ সাহেবঅ, ওপাকে যিব তো ডন্ডা খিব।' সঙ্গের ছবিটি যতীন সেন অঙ্কিত।

৫৩। নাল্পে সুখমস্তি : উপনিষদের সম্পূর্ণ শ্লোকটি হল 'নাল্পে সুখমস্তি/ ভূমৈব সুখম্।' অর্থাৎ অল্পে সুখ নেই। বিশ্ব জোড়া পেলে তবেই সুখ।

: কিন্তু অমল নিজে তো স্টেজের ধারে-কাছে ছিল না। তার পক্ষে —

: জানি। তাই আমার ধারণা অমল সাহায্য নিয়েছিল ব্রজরাখালের নয়, মণীশ ভদ্রের। যে ভদ্রলোক মাদ্রাজের চাকরিটা পাকা করেছে, বাড়িওয়ালাকে নোটিশ দিয়েছে এবং তার গাড়ির এককোট রঙ ফিরিয়েছে। কে জানে, বিশু পাল তার স্ত্রীর দিকেও কিছু দাক্ষিণ্য বিতরণের প্রয়াশ দেখিয়ে তারও বিরাগভাজন হয়েছিল কি না। ফলে, দেখুন প্রতুলবাবু — মাধব মিত্রের সঙ্গে আমিই একমত হতে পারছি না; ব্যোমকেশবাবু কি পারবেন?

প্রতুলবাবু শিরশ্চালন করে বলেন, মাথাটা একেবারে গুলিয়ে গেল। গরম এক পেয়ালা চা পেটে পড়লে হয়তো বুদ্ধিটা খুলতে পারে। দাঁড়ান, চাকরটাকে ডাকি।

রাখাল বললেন, শুভ প্রস্তাব। চা আসুক। ইতিমধ্যে আপনাকে আর একটা খবর দিয়ে রাখি। আপনার মনে আছে নিশ্চয় দাসরথী চক্রবর্তী তার এজাহারে বলেছিল, বিশুবাবু ঐদিন শো-র পরে তাকে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। কারনটা কি তা নাকি দাশু বাবুর মনে নেই। আমার জেরায় পড়ে দাশুবাবুর স্মৃতিশক্তির উন্নতি হয়েছে—তিনি স্বীকার করেছেন, আলোচনার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তার নির্ভুল ধারণা না থাকলেও সে একটা আন্দাজ করতে পারে। বিষয়টা ছিল, থিয়েটার থেকে ব্রজরাখাল ও সুলোচনার বিতাড়ন। যে-কোন কারণেই হ'ক, বিশু ওদের দুজনের উপরেই ভীষণ খাপ্পা হয়ে ওঠে। দাসরথীকে বলে, 'দুটোকেই তাড়াবো। আজ রাত্রেই। তুমি শো-র পরে অপেক্ষা কর, কথা আছে।' — ব্রজরাখাল ও সুলোচনা ওর থিয়েটারের অপরিহার্য অঙ্গ। সুলোচনা শুধু ওর থিয়েটারের নয়, জীবনেরও নায়িকা। ফলে, কোন মর্মান্তিক কারণ না থাকলে সে এভাবে নিজের পায়ে কুড়ুল মেরে ওদের তাড়াবার কথা চিন্তা করত না।

প্রতুলবাবু নীরবে শিরশ্চালন করতে থাকেন। যেন তাঁর পেপারে একটি ছেলেও পাস নম্বর পায়নি। সব ফেল!

এই সময় দু-কাপ চা এসে পড়ায় আলোচনাটা ব্যাহত হল।

৭.

ট্রেন থেকে ব্যোমকেশ যখন নামল তখন তার অবস্থা ঝোড়ো কাকের মত। স্টেশান থেকেই সে পর পর তিনটি টেলিফোন করল। প্রথমেই ডি.আই.জি. মজুমদার সাহেব।

: হ্যালো! মজুমদার স্পিকিং।

: আমি ব্যোমকেশ বক্সী হাওড়া স্টেশান থেকে বলছি। আমার টেলিগ্রাম পেয়েছেন?

: পেয়েছি। ব্যাপার কি? কোথায় গিয়েছিলেন আপনি?

: বৃন্দাবন। তা তীর্থদর্শনের ফলশ্রুতি কিছুটা হাতে হাতেই পেয়েছি। সব কথা তো টেলিফোনে বলা চলে না। তা এদিককার খবর কি?

: সন্দেহভাজন সব কয়জনই নজরবন্দী আছে। মাধব মিত্তির দাবী করছে সে এই রহস্যের কিনারা করে ফেলেছে। আজ সন্ধ্যা সাতটায় সে দু-জনকে থিয়েটার হল-এ এ্যারেস্ট করবে। বডি-ওয়ারেন্ট করানোই আছে। কোন দুজনকে তা টেলিফোনে বলা চলে না। কিন্তু সে কাউকে এ্যারেস্ট করার পূর্বে আমি আপনার রিপোর্টটা পেতে চাই। আপনারা যদি দু-জনে ভিন্ন ভিন্ন পথে একই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে থাকেন তাহলেই ভাল। কখন আপনার সঙ্গে দেখা হতে পারে?

ব্যোমকেশ বললে, ঠাকুর বলতেন, 'যত মত, তত পথ' আবার ইংরাজি প্রবাদবাক্য বলে সব পথেরই শেষ লক্ষ্যস্থল রোম-নগরী[৫৪]! জানি না, মাধববাবুর সঙ্গে রোম-নগরীতে গিয়ে মিলব কি না। আপাতত ঘড়িতে দেখছি এখন বেলা দেড়টা। আমার স্নানাহারও হয়নি। তাছাড়া আমার এখনও কয়েকটা কাজ বাকি আছে — অপরাধীকে চূড়ান্ত ভাবে সনাক্ত করতে। আমি যদি সন্ধ্যা সাতটায় থিয়েটার হলে উপস্থিত থাকি তাহলে চলতে পারে?

: খুব ভাল হয় তাহলে। আমি ঠিক আটটায় ওখানে আসব।

: আর একটা কথা স্যার। আমার অনুসন্ধান বলছে — শালীচরণ, মানে কালীচরণ দাস তার মেয়াদের শেষাশেষি জেলখানায় জমাদার বা ওয়ার্ডেন্ট[৫৫] হয়েছিল — তথ্যটা যাচাই করা যায়?

: অনায়াসে। ঘন্টা খানেকের মধ্যে সেটা খোঁজ নিয়ে জানাতে পারি। কেমন করে জানাব?

: ঘন্টাখানেক পরে আমিই আপনাকে ফোন করব। আপনার আরও একটি কাজ আছে স্যার। রাত আটটায় থিয়েটার হলে যাবার সময় গাড়ি করে একটি লোককে উঠিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তাঁর নাম আর ঠিকানাটা কাউন্ডলি লিখে নিন —

৫৪। লক্ষ্যস্থল রোম-নগরী : All roads leads to Rome -এর বঙ্গানুবাদ। রোমান সাম্রাজ্যের গরিমার দিনে রোম ছিল ইউরোপের কেন্দ্রবিন্দু। সকল রাস্তাই হয় রোম নগরীতে যেতে কিংবা রোমের পথের সাথে সংযুক্ত ছিল। এর ফলে রোমে বাণিজ্যও প্রভূত উন্নতি হয়।

৫৫। ওয়ার্ডেন্ট হয়েছিল : অপরাধীরা ভালো আচরণ করলে জেলেই তাকে তত্ত্বাবধায়কের পদে উন্নীত করা হয়।

দ্বিতীয় টেলিফোনটা সে করল প্রতুলচন্দ্রকে :

: হ্যালো। কে? ... ব্যোমকেশবাবু? আরে, কোথায় ছিলেন মশাই এতদিন? আপনার বাড়িতে তালা কেন? ... ও! গিন্নি বাপের বাড়ি গেছেন বুঝি? ... শুনুন, রাখাল সরকার আপনারে গোরু, ... মানে খুব খুঁজছে ... তাকে একটা ফোন করুন। ... কি বললেন? ও হ্যাঁ। সন্ধ্যা সাতটায় আমিও থাকব। কিন্তু আপনি কি সংবাদ নিয়ে এসেছেন বলুন তো? ও, টেলিফোনে বলা যাবে না বুঝি? আচ্ছা, থাক থাক, সাক্ষাতেই শোনা যাবে।

তিন নম্বর টেলিফোনটা ব্যোমকেশ করল সিংহ-রায় সলিসিটার্স অফিসের সিনিয়ার পার্টনারের কাছে। ব্যোমকেশের পরিচয় পেয়েই নিরঞ্জনবাবু বলে ওঠেন, — কী ভাগ্যের কথা! আপনি নিজে থেকেই ফোন করছেন! শুনুন মশাই, জরুরী খবর আছে!

: কী জরুরী খবর?

: আমার ওয়াইফ্ আপনাকে আর প্রতুলবাবুকে একদিন সান্ধ্য চায়ের আসরে নিমন্ত্রণ করতে চান। কবে আপনাদের সুবিধা হবে বলুন।

ব্যোমকেশ হতাশ হয়ে বলে, এই আপনার জরুরী খবর! আমি ভেবেছিলাম, আপনি বলবেন যে বিশুবাবুর দ্বিতীয় উইলখানা পাওয়া গেছে — রেজিস্ট্রি ডাকে সেখানা পেয়েছেন।

টেলিফোন হাতে লাফিয়ে ওঠেন সিংহমশাই : কী আশ্চর্য! আপনি কেমন করে জানলেন? হ্যাঁ, সেটাও একটা খবর বটে!

: তাহলে আমার অনুমান সত্য? রেজিস্ট্রি ডাকে উইলটা ফেরত পেয়েছেন? কে পাঠিয়েছে?

: কে পাঠিয়েছেন তা বোঝা যাচ্ছে না। খামের উপর টাইপ করে আমাদের নাম ঠিকানা নির্ভুল করে লেখা, অথচ প্রেরকের নাম খামের কোণায় যা লেখা আছে তার কোন মাথামুণ্ডু নেই।

: কি লেখা আছে?

: 'ঘোষ অব বি-পল — কুম্‌হি পার্ক — হেল!' অর্থহীন নাম-ঠিকানা।

: খামটা আপনার কাছে আছে তো?

: নিশ্চয়।

: আপনি পুলিসকে সব কথা জানিয়েছেন?

: আলবৎ! ইনভেস্টিগেটিং অফিসার এসে ফটো-স্ট্যাট কপি নিয়ে গেছেন।

: আমি এখনই আসছি আপনার অফিসে।

: আসুন। কিন্তু চায়ের নিমন্ত্রণটা—

: সে কথা সাক্ষাতে।

ঘন্টাখানেক পরে নিরঞ্জনবাবুর অফিসে পৌঁছে সে তাঁর অনুমতি নিয়ে প্রথমেই একটি ফোন করল ডি.আই.জি. সাহেবকে। মজুমদার ওকে জানালেন ওর অনুমান সত্য। শালীচরণ ওরফে কালীচরণ তার মেয়াদের শেষাশেষি কয়েদিদের ওয়ার্ডেন হয়েছিল। মজুমদার প্রশ্ন করলেন, এ তথ্যটা আন্দাজই বা করলেন কেমন করে, এবং সেটা আমাদের কাজেই বা লাগছে কিভাবে?

ব্যোমকেশ বললে, সেটা স্যার টেলিফোনে বলা যাবে না, কিন্তু আপনি আজ সন্ধ্যায় ঐ ভদ্রলোককে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তো?

: অফ কোর্স। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তাঁর বাড়ি আমি ইতিমধ্যেই লোক পাঠিয়েছি সংবাদ দিয়ে।

টেলিফোন লাইন কেটে দিয়ে এবার ব্যোমকেশ নিরঞ্জনবাবুকে বলে, এবার খামটা দেখান দিকি?

খামটা নিয়ে ব্যোমকেশ সেটাকে আতস কাচের সাহায্যে দীর্ঘসময় পরীক্ষা করল। তারপর তার মুখে ফুটে উঠল তৃপ্তির হাসি। বললে, অপরাধী এতক্ষণে চূড়ান্তভাবে ধরা পড়ে গেল।

: ঐ খামটা থেকে? কে পাঠিয়েছে ওটা?

: বিশু পালকে যে লোকটা খুন করেছে।

: কিন্তু সে কে?

: সে-কথা থাক। কিন্তু এ চিঠির প্রেরকের নাম ঠিকানার পাঠোদ্ধার করতে পারেন নি?

: না: পুলিশ-অফিসারও পারেননি। লেখা যা রয়েছে তা তো দেখছি "ঘোষ অব বি-পল। কুম্‌হি পার্ক। হেল।" তার মানে কি?

ব্যোমকেশ বললে, না। ওর বিশুদ্ধ পাঠ হচ্ছে "ঘোষ্ট অব্ বি পাল। কুম্ভীপাক[৫৬]। হেল।"

: তার মানে?

৫৬। কুম্ভীপাক : একরকম নরক। যে সব পাপী অন্য প্রাণীদের বধ করে ভক্ষণ করে, তাদের যমানুচরেরা এখানে এনে সুতপ্ত তেলে নিক্ষেপ করে যাতনা দেয়। কুম্ভী বা কলসীতে পাক হয় বলে একে কুম্ভীপাক বলা হয়।

শিল্পী অনুপ রায়ের চোখে ব্যোমকেশ

The Mystery of the Fortress & Other Stories, New Age Publishers (P) Ltd., 2009 থেকে গৃহীত।

: তার মানে — নরকের কুম্ভীপাক নামক পবিত্রস্থান থেকে বিশ্বনাথ পালের প্রেতাত্মা এই রেজিস্ট্রি চিঠির প্রেরক।

: এবং তার অর্থ?

: এবং তার অর্থ — এ থেকেই অপরাধী নিজেকে চূড়ান্তভাবে সনাক্ত করেছে। নরকের কুম্ভীপাক থেকে একজনই এ চিঠি পাঠাতে পারে। সেই হত্যাকারী!

নিরঞ্জন সিংহ মশাই যেন দাঁতের ডাক্তারের কাছে এসেছেন!

৮.

সন্ধ্যা সাতটা দশ। থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চের উপর অনেকগুলি চেয়ার সাজানো। পশ্চাৎপট দরবারের সীন। কেদারাগুলি সৌখীন — যেন রাজদরবারের দৃশ্য অভিনয় হচ্ছে। দরবারের কেন্দ্রস্থলে সিংহাসনে মধ্যমণির মত বসেছেন দারোগা মাধব মিত্র, যদিও তাঁর মাজায় তরবারির পরিবর্তে পিস্তল, মাথায় মুকুটের বদলে টুপি। তাঁর এক পাশে রাখাল সরকার অপর পাশে ব্যোমকেশ ও প্রতুলবাবু। সামনে, ওঁদের মুখোমুখি — অনুপস্থিত দর্শক দলের দিকে পিছন ফিরে বসেছেন অন্যান্য পাত্র মিত্র — ব্রজরাখাল, দাসরথী, মণীশ ও ডাক্তার অমল পাল। মহিলা ক'জন — জেনানার স্বাতন্ত্র রক্ষা করতেই বোধকরি — বসেছেন এক ধারে — সুলোচনা, নন্দিতা ও মালবিকা। একমাত্র প্রম্‌টার দাস বসেছে তার নির্দিষ্ট টুলে, উইংস-এর ধারে। প্রভু সিং অপর-প্রান্তের প্রসিনিয়াম ঘেঁষে; কাঞ্চনজঙ্ঘা টঙের উপর, যেখান থেকে সে আলোকসম্পাত নিয়ন্ত্রণ করে। আর সোমরিয়ার কোন নির্দিষ্ট আসন নেই। কখনও এখানে, কখনও ওখানে তার অঞ্চলপ্রান্ত দর্শন অথবা চুরির ঝনৎকার শ্রবণ করা যাচ্ছে।

সকলেই গম্ভীর, একটা আতঙ্কের রেশ চাড়িয়ে পড়েছে এঁদের উপর। ওঁরা বোধকরি সকলেই জানেন যে, একজোড়া স্টেনলেস্ স্টীলের বালা[৫৭] ওঁদের জন্য নেপথ্যে উদ্যত হয়ে আছে — কোন ভাগ্যবানের মণিবন্ধে তা উঠবে তা যদিও এখনও স্থির হয়নি। থিয়েটার হলের সামনে পুলিসের গাড়ি। কয়েকজন কনস্টেবল প্রহরারত।

মাধব মিত্র একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণান্তে সিগ্রেট ধরিয়েছেন। ভাষণে তিনি স্পষ্টাক্ষরে জানিয়ে দিয়েছেন যে, বিশু পাল হত্যার কিনারা হয়ে গেছে। আততায়ীকে চিহ্নিত করা গেছে এবং তিনি বর্তমানে স্টেজে উপস্থিত। তাঁকে এখনই গ্রেপ্তার করা হবে। তবে তার পূর্বে তিনি সকলকেই কিছু কিছু প্রশ্ন করতে চান। পৃথক এজাহার সকলেই দিয়েছেন। এখন সর্বসমক্ষে তিনি কয়েকজনকে কয়েকটি প্রশ্ন করবেন। প্রশ্নের উত্তর আর কারও জানা থাকলে তিনিও জবাব দিতে পারেন। ভূমিকা শেষ করে সিগ্রেট ধরিয়ে মাধব মিত্র সিগ্রেটের প্যাকেটটি রাখাল সরকারের দিকে বাড়িয়ে ধরেন এবং সাধারণভাবে একটি প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করেন, বিশু পাল পাঁচ বছর আগে একটি উইল করেছিলেন এ-কথা আপনাদের মধ্যে কেউ কি জানতেন?

সকলে একটু নড়ে চড়ে বসে। অমল পাল বললেন, আমি জানতাম।

সঙ্গে সঙ্গে সুলোচনা দেবীও বলে ওঠেন, আমিও জানতাম।

সোজা হয়ে বসেন মাধব দারোগা, তাই নাকি! অথচ কী আশ্চর্য দেখুন, আপনাদের দুজনের কেউই প্রথম জবানবন্দীতে একথা স্বীকার করেন নি।

কেউ জবাব দিলেন না এ অভিযোগের।

মাধব পাল বেছে নিলেন অমল পালকেই। তাঁকে বললেন, এ-কথা কি সত্য যে আপনার দাদা যখন প্রথমবার উইলে সই করেন তখন আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন?

: হ্যাঁ, সত্য।

: অথচ আপনার এজাহারে আপনি বলেছিলেন, দাদা কোন উইল করেছিলেন কি না, তা আপনি জানেন না। কেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার পাল একটু ভেবে নিয়ে বলেন, আমার ধারণা ছিল — দাদা সেই উইলখানা সলিসিটারের কাছ থেকে ফেরত নিয়ে আসেন।

: ধারণা কেন? তিনি যেদিন উইলখানা ফেরত নিতে যান সেদিন আপনি কি তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন না?

: ছিলাম। কিন্তু সলিসিটারের সঙ্গে দাদা যখন কথা বলেন তখন আমি ছিলাম তার পাশের ঘরে। দাদা শেষ পর্যন্ত উইলটা ফেরত নিলেন কি নিলেন না তা আমি নিশ্চিতভাবে জানতাম না।

৫৭। স্টেনলেস স্টীলের বালা : হাতকড়া বা Handcuff.

: কিন্তু আমি যদি বলি — যেদিন আপনার দাদা খুন হন সেই রবিবারের দুপুরে তিনি স্বহস্তে দ্বিতীয় উইলখানি লেখেন, এবং আপনি 'বেনিফিশিয়ারি' হওয়া সত্ত্বেও আপনাকে তিনি তাতে সই দিতে বলেন, এবং আপনি স্বাক্ষর করেন?

: এ কথা মিথ্যা।

: অর্থাৎ রবিবার ত্রিশে অগস্ট আপনার দাদা দ্বিতীয় উইলখানি স্বহস্তে লেখেননি, এবং আপনি তাতে স্বাক্ষর করেননি?

: তিনি আমাকে না জানিয়ে ঐ তারিখে দ্বিতীয় কোন উইল তৈরী করেছিলেন কিনা তা আমি কেমন করে জানব? করে থাকলে, তাতে আমার সই নেই!

: বেশ বুঝলাম। কিন্তু সুলোচনা দেবী, আপনি কেমন করে জানলেন যে, বিশুবাবু একটি উইল করেছেন?

: তিনি নিজেই আমাকে বলেছিলেন। জানিয়েছিলেন, আমাকে তাঁর গাড়িটি দিয়েছেন।

: তাহলে প্রথমবার জবানবন্দীতে সে-কথা বলেননি কেন?

: তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না! ওঁর মৃত্যুতে আমি দিশেহারা হয়ে পড়ি —

মাধববাবু ধমক দিয়ে ওঠেন, সে তো মৃত্যুর অব্যবহিত পরে। তারপর এ ক্রমশ: তো আপনি দিব্যি সামলে উঠেছেন। শ্যামবাজারের বাড়ি ছেড়ে শ্যামপুকুরে এসেছেন, যার ফলে শান্তি দেবীকে বাপের বাড়ি যেতে হল। তখনও কি আপনার মাথা ঠিক হয়নি?

সুলোচনার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে যায়। সে জবাব দিতে পারে না। শান্তি আসেনি, সে অসুস্থ। তাই ও-পাশ থেকে ব্রজরাখাল বলে ওঠে, আপনার প্রশ্নটা আমি ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারছি না ইন্সপেক্টরবাবু! শান্তি কেন বাপের বাড়ি গেল, সাবালিকা সুলোচনা কখন কোথায়—

তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে মাধব দারোগা বলে ওঠে, আপনাকে আমি ও প্রশ্নটা করিনি ব্রজরাখালবাবু। আপনাকে বরং আমি অন্য একটা প্রশ্ন করি — দেখুন তো এ প্রশ্নটা বুঝে উঠতে পারেন কি না : বিশু পাল বহু রজনী আপনার সঙ্গে কীচকের ভূমিকায় লড়াই করেছে। কোনবার তো আপনি এমনভাবে তার গলা টিপে ধরেননি যাতে তার দম বন্ধ হয়ে যায়? এবারই বা তা হল কেন?

: আপনি কি বলতে চান, আমি গলা টিপে তাকে মেরে ফেলেছি?

: না। আমি বল্‌তে চাই আপনি গলা টিপে তাকে অজ্ঞান করে দিয়েছিলেন মাত্র। মৃত্যু হয়েছে আপনার স্বহস্ত নিক্ষিপ্ত ভোলাটাইল হায়ড্রোসায়ানিক এ্যাসিডের গ্যাসে।

: ভঙ্গুর কাচের এ্যাম্পুল হাতে ঐভাবে আমার পক্ষে সাত-আট মিনিট মল্লযুদ্ধ করা সম্ভব?

: না। সম্ভব নয়। কাচের এ্যাম্পুলটা হয়তো ততক্ষণ ধরা ছিল আপনার 'পার্টনার-ইন-ক্রাইম' সুলোচনা দেবীর হাতে। এ্যাম্পুল ছাড়াও যাঁর হাতে ছিল কয়েক গাছা চুরি — যার ঝনৎকার শোনা গিয়েছিল অন্ধকারে অডিটোরিয়াম থেকে।

: এসব আপনার উর্বর-মস্তিষ্কের কল্পনা। আমি বিশু পালকে হত্যা করতে চাইলে নিশ্চয়ই তার গলা ও-ভাবে টিপে ধরতাম না। সন্দেহটা যে আমার উপরেই পড়বে এটুকু কি আমি বুঝতাম না?

: তাহলে ও-ভাবে কেন তার গলা টিপে ধরেছিলেন? বলুন?

ব্রজরাখাল একটু ভেবে নিয়ে বল্‌লে, তার কৈফিয়ৎ আমি জনান্তিকে আপনাকে দিতে রাজী আছি। সর্বসমক্ষে নয়।

মাধব মিত্র মনস্থির করে উঠ্‌তে পারে না। তার আগে ব্যোমকেশ বলে ওঠে, ব্রজরাখালবাবু, আপনি বৃথা সঙ্কোচ করছেন। হত্যামামলা কোর্টে যাবে। প্রসিকিউশান কাউন্সেলের প্রশ্নের জবাবে প্রকাশ্য আদালতে এ-কথা একদিন আপনাকে স্বীকার করতে হবেই। সেক্ষেত্রে আসামী হিসাবে নয়, সাক্ষী হিসাবে এখনই ওটা স্বীকার করে নেওয়া ভাল নয়?

ব্রজরাখাল জবাব দেয় না। গোঁজ হয়ে বসে থাকে।

ব্যোমকেশ বলে, বেশ, আমি প্রশ্ন করছি, আপনি জবাব দিন — একথা কি সত্য যে, আপনিই সুলোচনা দেবীকে এ থিয়েটারে নিয়ে আসেন, — তখনও শান্তিদেবীকে আপনি বিবাহ করেননি, এবং তখন আপনারা দুজন স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বাস করতেন?

ব্রজরাখাল এবারও জবাব দিল না। দিল সুলোচনা। বললে, হ্যাঁ সত্যি। তা থেকে কী প্রমাণ হয়?

ব্যোমকেশ তৎক্ষণাৎ সুলোচনার দিকে ফিরে বললে, আর একথাও কি সত্য নয় যে, ঘটনার পূর্বদিন আপনি ব্রজরাখালের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ ব্যবহার করেছিলেন যাতে বিশু পাল আপনার উপর ভীষণ চটে যায়? আপনাকে থিয়েটার থেকে তাড়িয়ে দেবার কথা সে ভাবতে শুরু করে?

সুলোচনা উদ্ধত ভঙ্গিতে বললে, আমি কারও বিবাহিতা স্ত্রী নই! আমার কোন আচরণে কেউ চটল না চটল, তাতে আমার ভারি বয়েই গেল।

ব্যোমকেশ এবার আবার ব্রজরাখালের দিকে ফিরে বললে, আপনিও ঠিক ঐ কথাই ভেবেছিলেন — সুলোচনা কারও বিবাহিতা স্ত্রী নয়! এই নিয়ে হয়তো বিশু বাবুর সঙ্গে আপনার একটা মন কষাকষি হয়েছিল, তাই নয়? অর্থাৎ ঘটনার দিন মল্লযুদ্ধটা নিছক অভিনয় ছিল না। মঞ্চের উপর দু-জনেই দুজনকে সত্যি সত্যি আক্রমণ করেছিলেন! স্বীকার করুন।

ব্রজরাখাল ইতিপূর্বেই তার ব্যাগ থেকে একটা চ্যাপ্টা বোতল বার করেছিল। পুলিসের উপস্থিতিতেই এবার সে বোতলের তরল পানীয় খানিকটা ঢেলে দেয় তার কণ্ঠনালীতে। বাঁ হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে ব্যোমকেশকে বললে, হ্যাঁ, তাই! বিশুও আমার হাতটা জখম করে দিয়েছিল। তার গায়েও ছিল অসুরের মত শক্তি! স্বীকার করছি, মঞ্চের উপর আমরা অভিনয় করিনি — মরদের বাচ্ছার মত লড়াই করেছি! কিন্তু, বিশ্বাস করুন — ঐ সব বিষ-ফিষ খাওয়ানোর মধ্যে আমরা নেই। না আমি, না সুলোচনা।

ব্যোমকেশ বললে, আমি বিশ্বাস করেছি, ব্রজরাখালবাবু!

মাধব দারোগা সোজা হয়ে উঠে বসে। তার সওয়াল করবার অধিকার কখন অলক্ষিতে কেড়ে নিয়েছিল ব্যোমকেশ। এতক্ষণে ব্যাপারটা খেয়াল হল তার। সে সিংহাসনে মঞ্চের কেন্দ্রবিন্দুতে বসে থেকেও কেমন যেন ক্রমশ: নেপথ্যে সরে যাচ্ছে। এতক্ষণে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় মিস্টার বক্সী! আপনি কী বিশ্বাস করেন না করেন তা শুনতে আমরা এখানে সমবেত হইনি। এটা কোনও সখের গোয়েন্দাগিরি নয় — একটা ক্রিমিনাল ইন্‌ভেস্টিগেশন। আপনি দয়া করে একটু স্থির হয়ে বসবেন কি?

ব্যোমকেশ চেয়ারে এলিয়ে বসে। নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলে, বসতে তো আমাকে হবেই, অন্তত মজুমদার মশাই যতক্ষণ না আসছেন।

: মজুমদার মশাই! কে মজুমদার-মশাই? — মাধব দারোগা কৌতূহলী!

: আপনার বড় সাহেব — ডি.আই.জি.।

রাখাল সরকার চম্‌কে উঠে বলে, সে কি! স্যার কি আজ এখানে আসবেন বলেছেন?

ব্যোমকেশ ঘড়ি দেখে বললে, এবম্ শ্রুয়তে! এমনই জনশ্রুতি। ঠিক আটটায়। তারপর মাধব মিত্রের দিকে ফিরে বললে, এখনও পনের মিনিট সময় আছে। আপনি চালিয়ে যান।

মাধব মিত্র একটু থতমত খেয়ে যায়। কিন্তু হাজার হোক সে পুলিসের দারোগা। সামলে নিয়ে বলে, বেশ তাহলে শুরু করা যাক। মণীশবাবু, আপনার সঙ্গে বিশু পালের যে কন্ট্রাক্ট হয়েছিল তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হতে আর কত বাকি?

মণীশ তৎক্ষণাৎ জবাব দেয় : একুশ দিন।

মাধব মিত্র এতক্ষণে তার সরসতা ফিরে পেয়েছে। হেসে বলে, বাপ্‌রে! আপনি যে নিখুঁত ক্যালকুলেশন করে বসে আছেন!

: সেটাই স্বাভাবিক। কারণ মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেই আমি দেড়া-মাইনেতে অন্য একটি চাকরিতে জয়েন করব।

: কোন চাকরি?

: আপনি তা ভাল রকমেই জানেন। মাদ্রাজে চিঠি লিখে সব রকম সন্ধানই তো নিয়েছেন আপনি!

মাধব দারোগা ধমকে ওঠে, আপনাকে যে প্রশ্ন করছি, ভদ্রভাবে তার জবাব দিন।

মণীশও রুখে ওঠে, অভদ্র জবাব আমি কিছু দিইনি। কিন্তু এভাবে আমাকে অহেতুক ফাঁসাতে পারবেন না। আমি যে খুন করিনি তা আমিও জানি আর আপনিও জানেন।

মাধব দারোগা হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, বটে! কিন্তু আমি যদি বলি, এভাবে স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড গাড়িটা বাগিয়ে নূতন চাকরির লোভে আপনিই বিশু বাবুকে খুন করেছেন?

: তাতে আমি বলব সেটাই আপনার থিয়োরি হলে আপনি অগাধ জলে! এ মিথ্যেটা প্রমাণও করতে পারবেন না এবং আসল অপরাধী দিব্যি নিষ্কৃতি পাবে।

মাধববাবু আরও কঠোর স্বরে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার পূর্বেই ডাক্তার অমল পাল অতি শান্ত কণ্ঠে বলেন, ইন্সপেক্টার সাহেব! আমি একটা কথা বলব?

: বলুন?

: আপনি এলোপাতাড়ি লাঠি ঘোরাচ্ছেন। একবার আমাকে, একবার ব্রজরাখালকে, একবার সুলোচনাকে, একবার মণীশকে। এরপর কি প্রভু সিং আর প্রম্‌টার দাশের পালা আসবে?

টঙের উপর থেকে কাঞ্চন একটা স্পট লাইট ফেলল অমল পালের মুখের উপর। বললে : জবর ডায়লগ ঝেড়েছেন দাদা! তবে একটা কথা — টঙের উপর আমিও আছি!

মাধব দারোগার চোখ দুটো জ্বলে ওঠে। অমল পালকেই বলে, তাহলে এলোপাতাড়ি লাঠি না ঘুরিয়ে একজনের উপরেই লক্ষ্য স্থির করি ডাক্তার পাল? কেমন? আপনাকেই বরং জিজ্ঞাসা করি — দেখুন তো এই সইটা কি আপনার?

ফাইল থেকে সে এক গোছা ফটোস্ট্যাট কাগজ বার করে একটা পাতা মেলে ধরে। ডাক্তার পালের মুখটা ছাইয়ের মত সাদা হয়ে যায়। কোন বাক্যস্ফূর্তি হয় না। মুখ তুলে তাকায়। মাধব দারোগা বলে, স্পট্ লাইটটা তো আপনার মুখের উপরেই আছে! কই, জবাব দিন?

ব্রজরাখাল আর থাকতে পারে না। বলে, কী কাগজ ওখানা?

: বিশু পালের উইল।

: উইল? তা অমলবাবু তো আগেই বলেছেন যে উইলে তাঁর স্বাক্ষর আছে।

: এটা সেই উইল নয়। এখানা তৈরী হয়েছে বিশুপালের মৃত্যুর দিন দুপুরে। অথচ সর্বসমক্ষে অমলবাবু বলেছেন যে, তাঁর জ্ঞাতসারে তাঁর দাদা সেদিন কোন উইল তৈরী করেননি। অন্তত: তাতে তাঁর সই নেই!

অমল পাল অসীম মনোবলে নিজেকে সামলে নেয়। বলে, তা থেকে কী প্রমাণ হয়? প্রমাণ হয় আমি ভুল বলেছিলাম।

: ভুল নয়, মিথ্যা!

: তাতেই বা কী? আমি দাদাকে খুন করলে তা করব এই থিয়েটারের মালিকানার লোভে — এই তো? দাদাকে খুন করে ঐ উইলটা বাঁচিয়ে রাখায় আমার স্বার্থ? তাছাড়া শেষ দৃশ্যের সময় আমি তো স্টেজের ধারে কাছে ছিলাম না!

: তা ছিলেন না। কিন্তু আপনি যদি অর্থমূল্যে কোন সহকারী নিয়োগ করে থাকেন?

: সে কে? ব্রজরাখাল অথবা মণীশ?

মাধব দারোগা জবাব দেবার আগেই ব্যোমকেশ আবার ফোড়ন কাটে, কিম্বা প্রভু সিং অথবা প্রম্‌টার দাস!

প্রতুলবাবু এতক্ষণ কোন কথা বলেননি। এবার তিনিও আর স্থির থাকতে পারেন না। বলে ওঠেন, কী বলছেন মশাই! প্রভু সিং অথবা প্রম্‌টার দাস!

ব্যোমকেশ একগাল হেসে বলে, না, মানে আমি কথার কথা বলছি। একটু আগেই অমলবাবু বলছিলেন না যে, লাঠির খোঁচা এখনও খায়নি মাত্র দুজন — প্রভু সিং আর প্রম্‌টার দাস!

কাঞ্চন স্পট লাইটটা এবার ব্যোমকেশের মুখে ফেলে বলে, আম্মো আছি দাদা! আমার এ্যালেবাই একটা নিপাট নিদ্রা!

এবার উইংসের প্রান্ত থেকে খিঁচিয়ে ওঠে প্রম্‌টার দাস, তুমি থাকতে চাও থাক, আমি বাপু ওর মধ্যি নেই! — তারপর ব্যোমকেশের দিকে ফিরে বলে, কে-কেমনতর লোক আপনি মশাই! আমি মরছি টাট্টাকার শোকে আর আপনি খা-খাম্মোকা আমায় খুনের মামলায় জড়াচ্ছেন!

উত্তেজিত হওয়ায় বেচারির জিহ্বা আজ বেশিমাত্রায় বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

ব্যোমকেশ হেসে বলে, তুমি চটছ কেন দাস? আমি তো বলেছি — ও একটা কথার কথা। অমলবাবু বললেন, তিনি স্টেজের ধারে-কাছে ছিলেন না, তাই আমি বললাম তাহলে উনি হয়তো কাঞ্চনমূল্যে —

: তা কা-কাঞ্চনমূল্য নিতে তো কা-কঞ্চনই আছে! ত্যাখন থেকে খালি 'আম্মো আছি, আম্মো আছি' করছে! আমাকে কেন? কাটা-ঘায়ে নুনের ছিটে দিলে ব্যা-ব্যা-ব্যা —

ব্যোমকেশ বাধা দিয়ে বলে, বেশ, এতে যদি এতই ব্যথা লাগে তাহলে না-হয় তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক উনি সহকারী করেছিলেন 'ক'-বাবুকে। অমলবাবুর সেক্ষেত্রে একটিমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ধরে নিতে হবে। মৃত্যুর পরে বিশু পালের কোন উইল থাকবে না। তাহলেই নিকটতম আত্মীয় হিসাবে সে দাদার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিই পাবে।

এবার রাখাল সরকার বলেন, সেক্ষেত্রে ডক্টর পাল প্রথমেই উইলটা নষ্ট করে ফেলত না কি?

: তাই তো ফেলেছিল সে। প্রথম উইলখানি কুচি কুচি করে, ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে এসেছিল।

: না, আমি দ্বিতীয় উইলখানার কথা বলছি।

ব্যোমকেশ বলে, হ্যাঁ! দ্বিতীয় উইলখানা। মনে করুন সে-খানাও যখন অমলবাবু ছিঁড়ে ফেলার উদ্যোগ করছেন তখন হঠাৎ তাঁর হাতখানা চেপে ধরলেন ঐ সহকারী ক-বাবু। ধরুন ক-বাবু তাঁকে বললেন, 'এমন কাজও করবেন না! এই উইলবলে দাদার নগদ ও কোম্পানির কাগজগুলি পাবেন, তা-ও লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি। কিন্তু এখানা ছিঁড়ে ফেলার পর যদি সুলোচনা আর একখানা উইল বার করে দাবী করে যে, ইতিপূর্বেই আপনার দাদা তাঁর সব কিছু সুলোচনাকে দিয়ে গেছেন? তখন যে বুড়ো-আঙ্গুল চুষতে হবে?' — একথা শুনে স্বতই অমল পাল থমকে যাবেন। কথাটা ভাববার। এ-ক্ষেত্রে ডা: পাল দ্বিতীয় উইলখানা প্রকাশও করতে পারবেন না, নষ্টও করতে পারবেন না। সেখানি সযত্নে রেখে দেবেন। স্থির করবেন, যদি আর কোন দাবীদার না দাঁড়ায় তাহলে এখানা ছিঁড়ে ফেলে থিয়েটার সমেত সব কিছু দখল নেবেন। দেখুন, সেই পথেই উনি অগ্রসর হচ্ছিলেন — উইলের উল্লেখ না করে আইন-সঙ্গত নিকটতম আত্মীয় হিসাবে তিনি সাক্সেশন সার্টিফিকেট দাবী করেছেন। তাই নয়?

প্রতুলবাবু বলেন, এমনটা হওয়া অসম্ভব নয়।

ব্যোমকেশ যোগ করে, কিন্তু তাই যদি ঘটে থাকে তাহলে ডাক্তার পাল ঐ দ্বিতীয় উইলখানা কোথায় রাখবেন? নিজের কাছে রাখবেন না, কারণ জানেন তাঁর বাড়ি সার্চ হতে পারে। সলিসিটারের কাছেও দিতে পারেন না। তিনি উপায়ান্তরহীন হয়ে সেখানা গচ্ছিত রাখবেন ঐ ক-বাবুর কাছেই। কারণ ক-বাবু তাঁর পার্টনার-ইন-ক্রাইম। বিশ্বস্ত লোক।

আবার বাধা দিয়ে ওঠে তোৎলা-দাস। বলে, কী মশাই ত্যাখন থেকে খালি 'ক্ক'-বাবু 'ক্ক'বাবু করছেন! 'ক্ক'-বাবুটা কে?

অধ্যাপক প্রতুলচন্দ্র তাকে থামিয়ে বলেন, আহাহা, 'ক'-বাবু একটা প্রতীক। একটা সিম্বল! ইকোয়েশন সল্‌ভ হলে সেটা জানা যাবে। আপাতত ওটা বীজগণিতের একটা প্রতীক চিহ্ন।

প্রম্‌টার তবু খুশি হয় না। বলে, সো-সোজা হিসাবে আসুন মশাই। আমরা আপনার মত পণ্ডিত নই। বীজগণিত-ফণিত আমরা কেউ বুঝি না।

ব্যোমকেশ বললে, ঠিক কথা। 'এ্যাবস্ট্রাক্ট' ছেড়ে একটা মনগড়া নামই নেওয়া যাক। ধরা যাক, ডাক্তার অমল পালের সেই অজ্ঞাত সহকারীর নাম 'শালীচরণবাবু'।

: শালীচরণবাবু? — এতক্ষণে মুখ খোলে ব্রজরাখাল।

: হ্যাঁ। তর্কের খাতিরে ধরুন লোকটার নাম শালীচরণ দাস।

ব্রজরাখাল তার বোতলের তলানিটুকু কণ্ঠনালীতে ঢেলে দিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, পারলাম না ধরতে। 'শালীচরণ দাস' নামে কাউকে আমরা চিনি না।

ব্যোমকেশ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললে, আপনাদের কেউই তাকে চেনেন না?

পর্যায়ক্রমে সে সকলের দিকে তাকিয়ে দেখে। মণীশ গোঁজ হয়ে বসে আছে, সুলোচনার চোখ দুটি বিস্ফারিত, ব্রজরাখাল বোতলটা ব্যাগে ভরতে ব্যস্ত, দাসরথী একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, টঙের উপর কাঞ্চনজঙ্ঘা কানে একটা দেশলাই কাঠি গুঁজে দিয়েছে — আবেশে তার দু-চোখ বন্ধ। প্রম্‌টার জ্বেলে টর্চ জ্বেলে তার টুলে ছারপোকা খুঁজছে। ঘরে অস্বাভাবিক নীরবতা।

কথা খুঁজে পায় অমল পালই। যেন সকলের হয়ে বলে, না। ও-নামের কাউকে আমরা চিনি না।

ব্যোমকেশ বলে, তাহলে আপনাদের একটা গল্প শোনাতে হয়। দশ বছর আগেকার ঘটনা। শালীচরণ দাস সে-যুগে বিশু-কীচকের বিপরীতে ভীমের পার্ট করত—

মাধব দারোগার হঠাৎ খেয়াল হল মধ্যমণির সিংহাসন থেকে সে দ্বিতীয়বার গদিচ্যুত হয়েছে। দ্বিতীয়বার ধৈর্যচ্যুত হল সে। বলে ওঠে, মিস্টার বক্সী! আমরা এখানে আপনার আষাঢ়ে গল্প শুনতে আসিনি। আপনি থামুন।

শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালের মতো অপরাধ ক্ষমা করেছিলেন, কিন্তু ব্যোমকেশ কিছু কলির কেষ্ট নয়, তার এটাও শিশুপাল বধ নয়, বিশুপাল বধ নাটক! ব্যোমকেশ বোমার মত হয়তো ফেটে পড়ত; কিন্তু ঠিক তখনই কে যেন উইংস-এর ধার থেকে ব্রজবুলিতে বলে ওঠে : মাধব! বহুত মিনতি করি তোয়[৫৮]!

সবাই চমকে ওঠে। সবচেয়ে বেশি চমকায় কাঞ্চন। চট করে সে স্পট লাইটটা ঘুরিয়ে ফেলে নেপথ্যের মুখে — তাঁর প্রবেশটা নাটকীয় করতে। দেখা গেল মঞ্চে প্রবেশ করছেন ডি.আই.জি.

৫৮। মাধব, বহুত মিনতি করি তোয় : বিদ্যাপতি রচিত ব্রজবুলিতে লেখা বিখ্যাত পদ।

'মাধব বহুত মিনতি করি তোয়
দেই তুলসী তিল, এ দেহ সমপিলুঁ
দয়া জনি না ছড়িবি মোয়'

মজুমদার সাহেব। তিনি বলতে বলতে আসছেন, ব্যোমকেশবাবুর আষাঢ়ে গল্পটা বেশ ইন্টারেস্টিং হবে মনে হচ্ছে। বাধা দিও না মাধব।

রাখাল ও মাধব আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছিল। মজুমদার-সাহেব হাত নেড়ে ওদের বসতে বললেন, নিজেও আসন গ্রহণ করে বললেন, চলুক, গল্প চলুক।

যেন কিছুই হয়নি, ব্যোমকেশ তার কাহিনীর জাল বুনে চলে। শালীচরণের অতীত কাহিনী। কালীচরণ কেমন করে শালীচরণ হল, কেমন করে জেলে গেল, কেমন করে ফিরে এসে বৈষ্ণব হল, কণ্ঠিবদল করল এবং বৃন্দাবনে হনিমুনে গেল বিশু পাল হত্যার দু-দিন পূর্বে। কাহিনী শেষে ব্যোমকেশ অমল পালের দিকে ফিরে বললে, এবার বলুন ডক্টর পাল। এ-হেন শালীচরণকে আপনি চেনেন না?

অমল পাল দৃঢ়স্বরে বললে, না! দাদার জীবনে অমন একটা ঘটনা ঘটেছিল বলে আমি জানি না। তা-ছাড়া আপনি নিজেই তো বললেন — দাদার মৃত্যুর দু'দিন আগে সেই শালীচরণ বৃন্দাবনে চলে যায়। সে ক্ষেত্রে তাকে সহকারী করে —

তাকে থামিয়ে দিয়ে ব্যোমকেশ বলে, ঠিক কথা। কিন্তু ধরুন যদি প্রমাণিত হয় শালীচরণ আদৌ বৃন্দাবনে যায় নি? সে কলকাতাতেই ছিল এবং বিশু পালের মৃত্যু সময়ে এই থিয়েটার হল-এই ছিল? যদি প্রমাণ করা যায় দ্বিতীয় উইলখানি বাঁচিয়ে রাখার একটি স্বার্থ শালীচরণেরও ছিল? সে খানি শালীচরণই রেজিস্ট্রি ডাকে সলিসিটার্সকে পাঠিয়ে দিয়েছিল?

অমল পাল রুখে ওঠে, তা-হলেও কিছুই প্রমাণ হয়না। অডিটোরিয়াম থেকে স্টেজে ওঠার গেটটা বন্ধ ছিল। শালীচরণ প্রেক্ষাগৃহ থেকে মাত্র পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ডের ভিতর —

ব্যোমকেশ বাধা দিয়ে বলে ওঠে, আর যদি প্রমাণ হয়ে যায়, প্রেক্ষাগৃহে নয়, উইংস-এর ধারে, মাত্র তিন হাত দূরে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে বসেছিল শালীচরণ?

অমল পাল গর্জে ওঠে, বেশ তো সেটা প্রমাণ করুন!

ব্যোমকেশ মজুমদার সাহেবের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করে। মজুমদার সাহেবও উইংসের ধারে প্রতীক্ষারত কনস্টেবল্‌কে ইঙ্গিত করেন। সে বেরিয়ে যায় এবং পরক্ষণেই যাকে নিয়ে ফিরে আসে তিনি আমাদের পরিচিত।

ব্যোমকেশ আগন্তুককে বলে, দেখুন তো বিজয়বাবু। এখানে আপনার বাড়িওয়ালা বোষ্টম শালীচরণবাবু উপস্থিত আছেন কিনা।

বিজয়বাবু সমবেত সকলের উপর চোখ বুলিয়ে যান। হঠাৎ একজনের দিকে তাকিয়ে তিনি চমকে ওঠেন। বলেন, এ কি কালীবাবু! আপনি এখানে! বৃন্দাবন থেকে কবে ফিরলেন?

যাঁকে প্রশ্ন করা হল তিনি জবাব দিলেন না। জ্যা-মুক্ত তীরের মত দ্বারের দিকে ছুটে চলে যান। কিন্তু কনস্টেবল এজন্য প্রস্তুত ছিল। তারা জাপটে ধরে শালীচরণকে। রাখাল সরকার ক্ষিপ্রগতিতে হ্যান্ডকাফ্‌টা পরিয়ে দেয় তাঁর মণিবন্ধে। ব্যোমকেশ বলে, এত কৌশল করেও তাহলে শেষ রক্ষা করা গেল না, শালীচরণবাবু!

শালীচরণ জবাব দেবার আগেই স্টেজের পিছন দিকে আর একটা ধস্তাধস্তির আওয়াজ। কনস্টেবল্ একটি লাল-শাড়ি-পরা যুবতীকে হাত ধরে নিয়ে এল। বললে, ইয়ে ছোক্‌রি ভি ভাগ্‌তি থি!

তাকে দেখে বিজয়বাবু বলে ওঠেন, আরে চপলা! তুমিও এখানে!

এতক্ষণে শালীচরণ তার কণ্ঠস্বর ফিরে পায়। বলে, মিস্টার বক্সী, বিশ্বাস করুন, চপলা এ হত্যাকাণ্ডের কিছুই জানে না।

ব্যোমকেশ বললে, বিশ্বাস করেছি।

প্রতুলবাবুর গাড়িতেই ব্যোমকেশ বাড়ি ফিরছিল। প্রতুলবাবু বললেন, কিন্তু আপনি কেমন করে কি করলেন বলুন তো! শালীচরণ দাসকে সনাক্ত করলেন কি করে?

ব্যোমকেশ বললে, কিছু যদি না মনে করেন প্রতুলবাবু — আজ আমি অত্যন্ত ক্লান্ত। কাল সারারাত ট্রেনে ঘুম হয়নি। আজও ধকল বড় কম যায়নি।

: ঠিক আছে, ঠিক আছে! আমি আরও একটা রাত্রি ধৈর্য ধরে থাকতে পারব। কিন্তু সত্যবতী-মাকে[৫৯] বলবেন, কাল সকালেই আমি আপনার বাড়িতে আসছি। আমাদের মোড়ের দোকানটায় সকালবেলা হিঙের কচুরি ভাজে। সেটা এক চ্যাঙাড়ি নিয়ে যাবার দায়িত্ব আমার। সত্যবতী-মাকে শুধু চায়ের জোগান দিয়ে যেতে হবে। কাল সকালেই এসে সব শুনব। আবার বাড়িতে তালা মেরে পালিয়ে যাবেন না যেন!

৫৯। সত্যবতী মা-কে : বন্ধুপত্নীকে মা বলে সম্বোধন!!

ব্যোমকেশ হেসে বলে, না, না, পালাব কোন দুঃখে? কাল সকালেই বলব আপনাকে — সবিস্তারে। অজিত হতভাগা বোম্বাই গেছে; নাহলে আর একটা জবর গল্পের প্লট পেত সে।

পরদিন সকালে মস্ত একটা খাবারের চ্যাঙাড়ি নিয়ে প্রতুলবাবু এসে হাজির হলেন ব্যোমকেশের কেয়াতলার বাড়ির সামনে। কিন্তু কী আশ্চর্য। ব্যোমকেশের বাড়ির সদর দরজায় প্রকাণ্ড একটা তালা ঝুলছে।

১

তিন দিন পরে প্রতুলবাবু ডাক যোগে একটি চিঠি পেলেন। ব্যোমকেশের চিঠি। খামের উপর বোম্বাই ডাকঘরের ছাপ। তারিখটা ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০। ব্যোমকেশ লিখেছে :

কথা দিয়েও কথা রাখতে পারলাম না। কী মর্মান্তিক প্রয়োজনে, হঠাৎ কলকাতা ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছি জানতে পারলে নিশ্চয় আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু সে-কথা পরে। আগে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি — কী করে 'বিশুপাল বধ'-রহস্যের কিনারা করলাম :

শালীচরণের উপর সন্দেহ হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। শালীচরণ দীর্ঘ দশটি বছর ধরে ঘানি পিষেছে ও প্রতিহিংসা পুষেছে। শালীচরণকে তাই আমরা মন থেকে তাড়াতে পারিনি। শত্রু বলতে বিশু পালের ঐ একজনই ছিল। কিন্তু শালীচরণের তরফে একটি অমোঘ অস্ত্র ছিল — তার বজ্রবাঁধুনি এ্যালেবাই। তার স্বহস্ত-লিখিত পোস্টকার্ড ৩১/৮ তারিখে বৃন্দাবনে সে ডাকে দিয়েছে — ঘটনার পরদিন, অথচ বৃন্দাবন কলকাতা থেকে দু-দিনের পথ। সুতরাং সন্দেহাতীত প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, ঘটনার সময় শালীচরণ বৃন্দাবনে ছিল। তা হোক, তবু আমার মনে হল শালীচরণ যদি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে বদ্ধপরিকর হয় তবে যে-কোন উপায়ে তাকে ঐ থিয়েটারে ঢুকতে হবে। বিশু পাল দশ বছর আগে প্রতিবেশী শালীচরণকে দেখেছে, এতদিন পরে সে হয়তো তাকে চিনতে পারবে না। তবু শালীচরণ নিশ্চয় কিছু ছদ্মবেশ ধারণ করবে হয়তো। মাথাটা কামাবে, হয়তো কোন মুদ্রাদোষ — যেমন তোৎলামির আশ্রয় নেবে। হিসাব করে দেখলাম, মঞ্চে যারা সে-রাত্রে উপস্থিত ছিল তাদের মধ্যে তিনজনের বয়স শালীচরণের হিসাবমতো বর্তমান বয়সের কাছাকাছি — ব্রজদয়াল, দাসরথী এবং প্রম্‌টার দাস। এদের মধ্যে প্রথমোক্ত দুজন দীর্ঘদিন থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত, একমাত্র প্রম্‌টার দাস নবাগত। শালীচরণ জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে মাত্র একমাস আগে এবং দেখা যাচ্ছে কালীকিঙ্কর থিয়েটারে ঢুকেছে মাত্র একমাস আগে। কালীকিঙ্করের প্রাক-একমাস জীবনের কথা আমরা জানি না। সে নাকি তার পূর্বে ডিম ফিরি করত, চায়ের দোকানে বয়-এর কাজ করত — এসব কথার কোনও প্রমাণ নেই, একমাত্র তারই নিজস্ব উক্তি। লক্ষ্য করে দেখলাম কালীকিঙ্করের মাথায় কদমছাঁট ছোট ছোট চুল এবং নিরঞ্জন সিংহ বলেছিলেন একমাস আগে শালীচরণ মাথা কামিয়ে ছিল। আরও লক্ষ্য করলাম, কালীকিঙ্করের কাছে একটি বিয়ারার চেক আছে যাতে মালিকের সই নেই। সন্দেহ হল, সে ওটা কায়দা করে সংগ্রহ করেছে — যাতে স্বতই আমরা মনে করি গরীব মানুষ কালীকিঙ্কর অন্তত সোমবার সকালের আগে কিছুতেই তার মালিকের হত্যাকাণ্ডে অংশ নিতে রাজী হবে না। গরীব? হ্যাঁ, গরীব বই কি! পিতৃদত্ত হাতঘড়িটা সে অর্থাভাবে বিক্রয় করতে বাধ্য হয়েছিল! আপনার মনে আছে, প্রতুলবাবু, আমি জবানবন্দী পড়ে বলেছিলাম — কোথায় কি যেন একটা অসঙ্গতি রয়ে গেছে। তখন বুঝতে পারিনি, পরে মনে পড়েছে কালীকিঙ্করের বাঁ-হাতের মণিবন্ধে ঐ সাদা দাগটাই সেই অসঙ্গতি। তার জবানবন্দী অনুসারে ছয়মাস আগে সে অত্যন্ত অর্থকষ্টে পড়েছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তখনও সে ঐ হাতঘড়িটা বিক্রয় করেনি। ডিমের ফেরিওয়ালা হাতে রিস্ট-ওয়াচ পরেছে, চায়ের দোকানের বয় সেটা পরেছে — অথচ বর্তমানে সেই লোকটা যখন পৌনে দুশ' টাকা মাইনের চাকরি করছে তখনই সেই পিতৃস্মৃতিটা অর্থাভাবে বিক্রয় করছে। ঘড়ি হাত থেকে খুলে নিলে এক মাস তার দাগ থাকে না। আমার স্বতই মনে হল, হয়তো ঘড়িটি সে বিক্রয় করেনি — থিয়েটারে আসবার আগে সেটা সে খুলে রেখে আসে। তাই দাগটা অমলিন আছে। আবার সে যদি শালীচরণ হয় তাহলে মাসখানেক আগে সে ছিল সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত আসামী। তখন সে যদি হাতঘড়ি না পরত তাহলে তার হাতে এমন দাগ হতে পারে না, অথচ সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত আসামী কেমন করে হাত ঘড়ি পরে? আমার মনে হল — হয়তো সে ওয়ার্ডেন পদে উন্নীত হয়েছিল এবং জেলার তাকে তার নিজস্ব হাতঘড়িটি ব্যবহার করতে দিয়েছিল সময় অনুযায়ী অন্যান্য কয়েদীদের পরিচালনা করতে। খোঁজ নিয়ে জানলাম, আমার অনুমান সত্য। আমার ধারণা হল ওর গরীবিয়ানা একটা ভেক। সে গরীব সেজে থাকতে চায়। তা যদি সত্য হয়, তবে বলতে হবে সে সকলকেই ঠকিয়েছে — মায় পুলিসের দারোগাকে

পর্যন্ত। লক্ষ্য করে দেখুন, মাধব দারোগা জবানবন্দীর প্রথমাংশে তাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করেছেন, কিন্তু যেই শুনেছেন যে, সে প্রাক্তন ডিম-ওয়ালা এবং ভূতপূর্ব চায়ের দোকানের বয় অমনি তাকে 'তুমি' পর্যায়ভুক্ত করেছেন। আরও একটা সূত্র লক্ষ্য করবার মত। শালীচরণের নামের সঙ্গে লোকটার নামের অদ্ভুত মিল। আশ্চর্য! এটা আপনারা কেউই খেয়াল করেননি। মনে করুন, শালীচরণ ছদ্মবেশে থিয়েটারে ঢুকতে চায় — তাহলে সে কী-জাতীয় ছদ্মনাম বেছে নেবে? নামটা সে কিছুতেই আমূল পরিবর্তন করবে না। ধরুন সে নাম নিল 'বিমল দত্ত' কিম্বা 'অজিত সেন'। কলকাতার থিয়েটারে হরেকরকম লোক নিত্য আসে। তাদের মধ্যে থিয়েটারের লোকের সামনে কেউ যদি ওকে আচম্‌কা 'কালিবাবু' বা 'দাস-মশাই' বলে ডেকে বসে তাহলে সন্দেহের উদ্রেক করত। তাই 'কালীচরণ দাস' নাম সামান্য বদলে সে 'কালীকিঙ্কর দাস' সাজল। এ থেকে ব্যাপারটা প্রায় ধরে ফেললাম। তখন আমার কাজ হল শালীচরণের একাগ্নি ব্রহ্মাস্ত্রটাকে প্রতিহত করা — ওর এ্যালেবাইটা[৬০] ভেঙে ফেলা। আমার সন্দেহ হল, শালীচরণ আদৌ বৃন্দাবন যায়নি — ঘটনাচক্রে বৃন্দাবনযাত্রী কোন সহকারীর হাতে সে ঐ চিঠিখানা ৩১/৮ তারিখে বৃন্দাবনের ডাক বাক্সে ফেলার ব্যবস্থা করে[৬১]। সে সহকারী কে তা জানি না, তবে দশ বছর ঘানি ঘুরিয়ে সে হয়তো অনেক ক্রিমিনালের বন্ধু হয়ে থাকবে। আমি সোজা বৃন্দাবন চলে গেলাম। সেখানে সন্ধান নিয়ে জানলাম, 'নিত্যানন্দ পাড়া, মহাপ্রভু রোড এবং শ্রীগুরুধাম' সবই শালীচরণের উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা। কলকাতায় ফিরে এসে শুনলাম দ্বিতীয় উইলখানি মিস্টার সিংহ রেজিস্ট্রি ডাকে পেয়েছেন। এ একটা নূতন সূত্র। এ-সূত্র ইঙ্গিত করছে শালীচরণই যদি অপরাধী হয় তাহলে দ্বিতীয় উইলখানির সঙ্গে তার স্বার্থ জড়িত। কিন্তু দ্বিতীয় উইলখানির সঙ্গে শালীচরণের কী স্বার্থ জড়িত থাকতে পারে? ভেবে দেখলাম, দ্বিতীয় উইলে লাভ হচ্ছে একটি মাত্র প্রাণীর — সোমরিয়ার। চকিতে মনে পড়ে গেল দুটি কথা — অন্ধকারে চুড়ির ঝনৎকার শুনেছিলেন আপনি, আর শালীচরণের অন্তর্ধানের সঙ্গে আরও একটি মেয়ে হারিয়ে গেছে — ঝি চপলা! কিন্তু চপলা বাঙালী, সোমরিয়া হিন্দুস্থানী। রাখালবাবু বললেন, তা নয় — সোমরিয়াও বাঙালিনী! আমি ছুটে গেলাম সিংহ-রায় সলিসিটার্স অফিসে। মজা হচ্ছে এই যে, শালীচরণ ওরফে প্রম্‌টার কালীকিঙ্কর ছিল রসিক প্রকৃতির মানুষ। আকৃতির চেয়ে প্রকৃতির পক্ষে ছদ্মবেশ ধারণ করা আরও কঠিন। শালীচরণ চূড়ান্তভাবে ধরা পড়ে গেল একটি রসিকতা করতে গিয়ে। রেজিস্ট্রিডাকে প্রেরকের নামে সে যে মারাত্মক রসিকতা করেছিল তাতেই তাকে সন্দেহাতীতরূপে সনাক্ত করলাম। কারণ আর সকলেরই মোটিভ ছিল অর্থ প্রাপ্তি। তারা মৃত বিশু পালকে নরকে পাঠাতে চাইবে না। অপরপক্ষে দশ বছর ঘানি ঘুরিয়ে শালীচরণ তার মৃত্যুতেও যেন তৃপ্ত হতে পারল না। তার আত্মাকে নরকের কুম্ভীপাকে পাঠাতে চাইল। তাতেই প্রমাণ হল, হত্যার উদ্দেশ্য অর্থ প্রাপ্তি নয়, প্রতিহিংসা! বেচারি শালীচরণ!

আর একটা কৈফিয়ৎ বাকি রইল — কেন আমি কথা রাখতে পারলাম না।

সে-রাত্রেই বোম্বাই থেকে একটা মারাত্মক ট্রাঙ্ক-কল আসে। অজিত ক-দিন পূর্বে একটা সিনেমার চিত্রসত্ত্ব বিক্রয়ের ব্যাপারে বোম্বাই আসে। ট্রাঙ্ক-কলে জানতে পারলাম — সে নাকি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ভোরের প্লেনেই আমি আর সত্যবতী বোম্বাই চলে এসেছিলাম। মঙ্গলবার সকালে এখানে এসে পৌঁছাই। আপনি জানেন, অজিত আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু। দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক। সেই ১৩৩১ সালে, হ্যারিসন রোডের মেসে তার সঙ্গে আলাপ। এই সুদীর্ঘকাল তার সঙ্গে একই ছাদের নিচে কেটেছে আমাদের জীবন। যেন আমাদের প্রতীক্ষাতেই তার প্রাণটুকু টিকে ছিল। হঠাৎ থম্বোসিস্-এর আক্রমণ! তখন ওর কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। তবু জ্ঞান ছিল স্পষ্ট। আমাকে দেখে ম্লান হাসল; আমার হাতখানা তুলে নিয়ে বললে, এবার থেকে কে তোমার সত্যান্বেষণের গল্প লিখবে?

আমি জবাব দিতে পারিনি।

সত্যবতীর অবস্থা আমার চেয়েও করুণ। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা এসেছি দুজনে হাসপাতালে। ওর খাটের পাশে বসে আছে সত্যবতী — যেন পাষাণ প্রতিমা! তার চোখে জল ছিল না। সে যেন কাঁদতেও ভুলে গেছে। নীরবে মৃত্যুপথযাত্রীর মাথার চুলগুলো বিলি কেটে দিচ্ছিল। অজিত হঠাৎ তার হাতখানা চেপে ধরল। নিজের জ্বরতপ্ত কপালে একবার সেই শীতল হাতখানা চেপে ধরল। তারপর অস্ফুটে বললে, গাড়িখানা তোমরা—

সে কী বলতে চেয়েছিল জানি না। সত্যবতী ওর মুখে চেপে ধরল।

এইমাত্র শ্মশানকৃত্য সেরে ফিরে এলাম। জীবনটা একেবারে শূন্য হয়ে গেল। সত্যবতীর অবস্থা আমার চেয়েও খারাপ। তাকে দেখলে চেনা যায় না। সবচেয়ে অদ্ভুত সে কাঁদছে না। এমন মর্মান্তিক

৬০। এ্যালেবাই : অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সময় সন্দেহভাজন ব্যক্তির অকুস্থলে না থাকার প্রমাণ পেশ করা।

৬১। ফেলার ব্যবস্থা করে : আগাথা ক্রিস্টির মার্ডার অব রজার অ্যাক্রয়েড উপন্যাসেও অপরাধী অন্য একজনকে দিয়ে একই ভাবে ভুয়ো ফোন করায়।

আমার অমিত-জ্যোতিষের গণনা শুরু হয়ে গিয়ে। শাড়ি হল শেষ পর্যন্ত সত্যবতীর। — হল? আবার সত্যবতী ঐ শাড়ি চড়বে কোনদিন?

: ইন্দ্রিয় বক্সী-সাহেব, আড়ি বড় শাড়ি —

উনি সারমাথে আমিয়ে দিয়ে বলি, শাড়ি আর আপনাকে দিতে হবে না। অমিতের কোন উত্তরাধিকারী নেই —

: না! আমি তাঁর উত্তরাধিকারী! — এতক্ষণে কথা বলে উঠলেন সত্যবতী!

আমি স্তম্ভিত। এ কী বলছে সত্যবতী? ওর দিকে ফিরে বলি, কিন্তু —

সত্যবতী দু'হাতে প্রতিবাদ করে, কোন 'কিন্তু' নেই! শাড়িটা অমিতের রীতিমত অর্জিত আবদার। ওটা কোথায় যেত বল?

প্রকৃতপক্ষে, সত্যান্বেষণ আমার জীবনের ব্রত। শক্তের ভক্ত নই। সত্যের গোপন হতে না। সত্যবতীর এ-কথায় এখনই প্রচণ্ড খিলখিল আমার অন্তঃস্থলে নিঃশব্দে উঠল। কেন আমার হয়তো অনেক পরে বুঝলাম। কী আশ্চর্য! কী অলৌকিক আশ্চর্য! এতদিন ঘর করেও আমি আমার স্ত্রীকে চিনি না! হ্যাঁ, শাড়ির প্রতি ওর অনেক লোভ দেখছি, আমাকে অমিত আমাকে বার বার পরামর্শ দিয়েছেন ওর সে ইচ্ছে পূরণ করতে, কিন্তু ওর সে লোভ কি এমনই নির্লজ্জ যে অমিতের মৃত্যুর আঘাতকেও তা ছাপিয়ে উঠবে?

সত্যবতী সেই অনুমতি ভদ্রলোকের দিকে ফিরে অসহায়ের মতো, হ্যাঁ, শাড়িটা আপনাকে দিতে হবে। নিয়মই তাই, একমাত্র উত্তরাধিকারী। যে হাসপাতালে অমিতের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, সেই হাসপাতালের। আমিও তাঁর উত্তরাধিকারী। তবে অমিত আমার নির্দেশটা — সেই শাড়ির গায়ে লেখা হবে: সাহিত্যিক অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের দান।

এতক্ষণে পাথরে চোখ বোজে এল চোখের জল। দু-হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল সত্যবতী ঘর থেকে। আবার মনে মনে বললুম — এতদিন ঘর করেও আমি আমার স্ত্রীকে চিনি না!

জানি, আপনি কী বলতে চাইছেন বক্সী-দা। সে কথার জবাব দিতে পারি। হ্যাঁ, এর আগেও সত্যান্বেষী হিসেবে আপনার গোয়েন্দা-কাহিনী! গোয়েন্দারা ঐ ধরনের রহস্যের সমাধান-ও। এ-ক্ষেত্রে তাদের নিস্তার নেই। ওরা মরেও মরে না। এরাই তাদের প্রমাণ! শিরোনাম, শার্লক হোমস; হারকুল পোয়ারো, ফেলুদা ব্যোমকেশ মরেও মরে না! নতুন নাম নিয়ে ফিরে আসে। তবে আমার অমিতের জীবন-কাহিনী হয়ত আপনারা কোনদিন জানতে পারবেন না। সে ঘটনার সত্য! সেজন্য আর্থিক বাংলা সাহিত্যের, মঙ্গলের সম্পদ আমাদের জন্য দিল যে সম্ভাবনার উত্তর শেষ হয়ে গেল অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মার বিদায় জানাচ্ছি।

ইতি চিরবিদায়কালে

ব্যোমকেশ বক্সী॥"

আঘাতে সে যদি একবার হু হু করে কেঁদে উঠত, তাহলে আমার বুকের পাষাণভারটা নেমে যেত। কিন্তু সত্যবতী বুঝি পাথর হয়ে গেছে। বুদ্ধিভ্রংশ যে তার হয়নি তা বুঝতে পারি — হাসপাতাল থেকে যখন আমরা রওনা হলাম তার আগে ও অজিতের কপালে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দিল, গলায় মালা পরিয়ে দিল, মাথার চুলে চিরুনি বুলিয়ে দিল — মায় বুক পকেটে ফাউন্টেনটাও আটকে দিল, যেন অজিত ওপারে গিয়েও লিখতে থাকবে।

: বলহরি — হরিবোল!

আমারা রওনা হয়ে পড়লাম শ্মশানের দিকে। অনেক বাঙালী এবং অবাঙালী — পরিচিত এবং অপরিচিত এসেছিল শেষ যাত্রায় যোগ দিতে। যারা ওর লেখা পড়তে ভালবাসত। সত্যবতী পাষাণ প্রতিমার মত দুয়ারের চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়েই রইল।

তারপর আজ সকালের কথা। যে গুজরাতী ভদ্রলোক অজিতের কাছ থেকে ওর গ্রন্থের চিত্রস্বত্ব কিনেছেন তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। বেশ সজ্জন ব্যক্তি। সহানুভূতি জানাবার পর প্রশ্ন করলেন, মিস্টার বক্সী, আপনি তাঁর ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন, আমাকে বলুন অজিতবাবুর ওয়ারিশ কে? গাড়িখানা কার নামে রেজিস্ট্রি হবে এ-অবস্থায়?

আমি জানতাম অজিতের তিন কুলে কেউ নেই। গাড়ি সে কিনতে চেয়েছিল আমার উপর টেক্কা দিতে — আমার কোষ্ঠীর ফলাফল ব্যর্থ করতে। না! কথাটা ঠিক হল না। গাড়ি সে কিনতে চেয়েছিল শুধুমাত্র সত্যবতীর মুখ চেয়ে। ওদের দুজনের মধ্যে একটা ভাইবোনের প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। অজিত জানত সত্যবতীর ভীষণ সখ একটা ছোট্ট ফিয়াট গাড়ির। অজিত পুরুষকারের মাধ্যমে আমার ফলিত জ্যোতিষের গণনা ব্যর্থ করে দিল। গাড়ি হল শেষ পর্যন্ত সত্যবতীর। হল? পারবে সত্যবতী ঐ গাড়ি চড়তে কোন দিন?

: কহিয়ে বক্সীসা'ব, আভি বহ্ গাড়ি—

ওঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলি, গাড়ি আর আপনাকে দিতে হবে না। অজিতের কোন ওয়ারিশ নেই —

: না! আমি তাঁর ওয়ারিশ! — এতক্ষণে কথা বলে উঠল সত্যবতী।

আমি স্তম্ভিত। এ কী বলছে সত্যবতী? ওর দিকে ফিরে বলি, কিন্তু—

সত্যবতী দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করে, কোন 'কিন্তু' নেই! গাড়িটা অজিতবাবু রীতিমত অর্জন করেছেন। ওটা ছেড়ে দেব কেন?

প্রতুলবাবু, সত্যান্বেষণ আমার জীবনের ব্রত! আপনার কাছে তাই সত্যটা গোপন করব না। সত্যবতীর এ-কথায় একটা প্রচণ্ড ছিছি-কারে আমার অন্তঃকরণ বিষিয়ে উঠল। যেন আকণ্ঠ হলাহল পান করলাম। কী আশ্চর্য। কী অপরিসীম আশ্চর্য? এতদিন ঘর করেও আমি আমার স্ত্রীকে চিনি না! হ্যাঁ, গাড়ির প্রতি তার বরাবরই লোভ ছিল, আপনি — অজিত আমাকে বারে বারে পরামর্শ দিয়েছেন তার সে ইচ্ছা পূরণ করতে। কিন্তু তার সে লোভ কি এমনই হিমালয়ান্তিক যে অজিতের মৃত্যুর আঘাতকেও তা ছাপিয়ে উঠবে?

সত্যবতী সেই গুজরাতী ভদ্রলোকের দিকে ফিরে স্পষ্টস্বরে বললে, হ্যাঁ, গাড়িটা আপনাকে দিতে হবে। ফিয়াট নয়, একখানা এ্যাম্বুলেন্স। যে হাসপাতালে অজিতবাবু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন, সেই হাসপাতালকে। আমিই তাঁর ওয়ারিশ। শুনে রাখুন আমার নির্দেশটা, সেই গাড়ির গায়ে লেখা থাকবে : 'সাহিত্যিক অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের দান'।

এতক্ষণে পাষাণ ফেটে নেমে এল জলোচ্ছ্বাস। দু-হাতে মুখ ঢেকে ছুটে বেরিয়ে গেল সত্যবতী ঘর ছেড়ে। আবার মনে মনে বললুম — এতদিন ঘর করেও আমি আমার স্ত্রীকে চিনি না!

জানি, আপনি কী জানতে চাইবেন অতঃপর। সে কথার জবাবটাও লিখে যাই। হ্যাঁ, এর পরেও সত্যান্বেষণ করবে আপনাদের ব্যোমকেশ বক্সী। ব্যোমকেশরা ঐ করতেই জন্মেছে যে। এ-থেকে তাদের নিস্তার নেই। তারা মরেও মরে না। এটাই তাদের ট্রাজেডি! দিগিন্দ্রবিজয়[৬২], শার্লক হোম্‌স[৬৩], য়্যারকুল প্যারো[৬৪], পিয়ারি ম্যাসনরা[৬৫] মরেও মরে না। নতুন নামে ফিরে ফিরে আসে। তবে আমার পরবর্তী কীর্তি কাহিনী আর আপনারা কোনদিন জানতে পারবেন না। কে জানাবে বলুন? গতকাল অর্থাৎ বাইশে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার সকাল আটটা পনের মিনিটে[৬৬] সে সম্ভাবনার উপর শেষ যবনিকাপাত করে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে।

ইতি চিরবিদায়কামী
ব্যোমকেশ বক্সী।।"

৬২। দিগিন্দ্রবিজয় : পাঁচকড়ি দে (১৮৭৩-১৯৪৫)-র সৃষ্ট জমিদার তনয় দিগিন্দ্র বিজয় ও তার গুরু অরিন্দম বাংলা গোয়েন্দা কাহিনির অপূর্ব সৃষ্টি। তার বিখ্যাত কাহিনিগুলো হল হত্যাকারী কে, হরতনের নহলা' (শার্লক হোমসের প্রথম বাংলা অনুবাদ; সাইন অব ফোর)

৬৩। শার্লক হোমস্ : আর্থার কোনান ডয়েল সৃষ্ট অমর চরিত্র। A Study in Scarlet উপন্যাসে আত্মপ্রকাশ (১৮৮৭)। চারটি কাহিনি বাদে সব কটিই তার সহকারী জন ওয়াটসনের জবানিতে লেখা। সম্ভবত পৃথিবীর জনপ্রিয়তম গোয়েন্দা।

৬৪। য়্যারকুল প্যারো : আগাথা ক্রিস্টি সৃষ্ট অবসর প্রাপ্ত বেলজিয়ান গোয়েন্দা। তাকে নিয়ে ৩৩টি উপন্যাস, একটি নাটক ও ৫০টিরও বেশি গল্প লিখেছেন ক্রিস্টি। তার বিখ্যাত কাহিনিগুলো Murder of Rodger Ackroyd, Murder in Orient Express ইত্যাদি।

৬৫। পিয়ারি ম্যাসন : কাঁটা সিরিজের পি. কে. বাসুর অনুপ্রেরণা। আর্থ স্ট্যানলি গার্ডনার সৃষ্ট এই চরিত্রটি পেশায় ডিফেন্স অ্যাটর্নি। তাকে নিয়ে প্রায় ৮০টি উপন্যাস লিখেছেন গার্ডনার। বেশিরভাগ রহস্যই উন্মোচিত হয় কোর্টরুমে।

৬৬। বাইশে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার, সকাল আটটা পনেরো মিনিট : ১৯৭০ সালের এই দিন, এই সময়েই দেহত্যাগ করেন স্বয়ং শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্যোমকেশের জন্ম ১৯০৪-এর ১৩ জুলাই। অজিত তার থেকে তিন মাসের বড়ো। ফলে অজিতের জন্মদিন ১৯০৪ এরই ১৩ এপ্রিল। অর্থাৎ মৃত্যুকালে অজিতের বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর ৫ মাস ৯ দিন। শরদিন্দুর জন্ম ৩০ মার্চ ১৮৯৯। অর্থাৎ মৃত্যুকালে সর্বজ্ঞ কথকের বয়স হয়েছিল ৭১ বছর ৫ মাস ২৩ দিন।

টিকা : কৌশিক মজুমদার